বিখ্যাত বিচার কাহিনী

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা

"পাপকে ক'রো ঘৃণা—ক'রো না পাপীকে"

—যীশু খ্রীষ্ট

★

ক্লার্ক-ফুলাম হত্যা রহস্য

বাওলা হত্যাকাণ্ড

সামসেদ বাঈ হত্যা

প্লেগ-জীবাণুঘটিত হত্যাকাণ্ড

পাগলা খুনের মামলা

সতীদাহ রহস্য

রাজার কামলীলা

ভালোবাসার জন্য, প্রেমের জন্য, মানুষ পৃথিবীতে করেনি এমন কাজ নেই। নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে বিড়ম্বিত হয়েও স্বার্থত্যাগ ও আত্মদানের যেমন সে চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, তেমনি মোহাবিষ্ট কামাতুর হয়ে সমাজ সংস্কৃতি ন্যায় ধর্ম কোন কিছুই ভ্রূক্ষেপ করেনি—বর্বরতার চরম সীমায় নেবে গেছে, কুৎসিত ঘৃণিত নৃশংসতার আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু পরিণামে দুষ্কৃতির ফল মানুষকে ভোগ করতেই হয়েছে, এর হাত থেকে কেউই নিষ্কৃতি পায়নি—বিচারের ন্যায়দণ্ডে তার জীবনান্ত ঘটেছে হয় ফাঁসির মঞ্চে, না হয় অপঘাতে আততায়ীর হাতে।

এমনি একটি মানুষের নিছক কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থের অতি নীচ তুলনাহীন কাহিনীই এই রচনার বিষয়বস্তু। একাধারে এই কলঙ্ককাহিনী যেমন রোমাঞ্চকর, অন্য দিকে তেমনি হত্যাকাণ্ডে বীভৎস।

ভাগ্যচক্রের অদৃশ্য ইঙ্গিতে কর্মোপলক্ষে দুই পরিবারের মিলন ঘটে মীরাটে। এবং এইখানেই বাস্তব-জীবনের এই রোমাঞ্চকর নাটকের সূত্রপাত হয় ১৯০৯ সালে। এদের একজন ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের নিম্নপদস্থ ব্যক্তি, নাম : লেফটন্যান্ট ক্লার্ক ; অপর জন মিলিটারী একাউণ্টসের ডেপুটি এগ্‌জামিনার, এডোয়ার্ড ফুলাম।

লেফট্‌নেণ্ট ক্লার্ক ছিলেন জাতিতে ফিরিঙ্গি এবং তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় বিয়াল্লিশ বৎসর। শিক্ষা-দীক্ষা বলতে তাঁর বিশেষ কিছুই ছিল না এবং চরিত্রের দিক থেকেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত কামুক ও নৃশংস প্রকৃতির। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মহিলা, এবং স্বামীর চেয়ে তিনি প্রায় ছ'বছরের বড় ছিলেন। অর্থাৎ এই বীভৎস ঘটনার সূত্রপাতে (১৯১০ সালে) তাঁর বয়স হয়েছিল আটচল্লিশ বৎসর। জাতিতে এই মহিলাটিও ছিলেন ফিরিঙ্গি এবং বিবাহের পূর্বে কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে নার্সের কাজ করতেন। এক-কথায় অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ও সাদাসিদে ভালোমানুষ গোছের মহিলা ছিলেন মিসেস্ ক্লার্ক। পুত্র-কন্যা প্রতিপালন ও সুচারুরূপে সংসারধর্ম নির্বাহই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র আদর্শ। শেষ নিঃশ্বাসপাতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁর বিষময় জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, সমস্ত নির্যাতন নীরবে সহ্য করে গিয়েছেন—কোন দিনই মুখ ফুটে কারুর কাছে একটি অভিযোগের কথাও প্রকাশ করেন নি।

এডোয়ার্ড ফুলাম এই বীভৎস ইতিহাসের অপর হতভাগ্য ব্যক্তি। অত্যন্ত ভদ্র ও শান্ত প্রকৃতির ধার্মিক পুরুষ বলে সর্বত্র তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি মিলিটারী একাউণ্টসে ডেপুটি এগ্‌জামিনারের কাজ করতেন পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় চুয়াল্লিশ বৎসর এবং তাঁর স্ত্রী আগাথা ফুলাম বয়সে তাঁর চেয়ে প্রায় আট বছরের ছোট ছিলেন। এই ভদ্রমহিলা ছিলেন জাতিতে ইংরেজ, উচ্চশিক্ষিতা এবং সাহিত্যানুরাগিণী। ছেলেমেয়েদের প্রতি তাঁর যেমন স্নেহপ্রবণতা ছিল, তেমনি ঘর-সংসারের কাজ-কর্মেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। নানা প্রকার সামাজিকতা, লোকলৌকিকতা ও আমোদ-আহ্লাদে হেসে-খেলে দিন

কাটানোই ছিল তাঁর জীবনের বিশেষ অঙ্গ। বাইরের দিক থেকে তাঁকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় চরিত্রের মহিলা বলে মনে হলেও, তাঁর চরিত্রের সবটাই ছিল বোধ হয় লোক-দেখানো।

১৯০৯ সালে মীরাটে এই দুই পরিবার বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হলেও, প্রকৃত ঘটনার সূত্রপাত হয় ১৯১০ সালে। মিসেস্ ফুলাম তখন সবে মাত্র একটি সন্তান প্রসব করে রোগশয্যাশায়িনী, লেঃ ক্লার্ক ডাক্তার হিসাবে তাঁকে দেখাশুনা করতে আসেন। ডাক্তার নির্দেশ দিয়ে যান, রোগিণীর পরিচর্যা চলে—অতি সাধারণ ঘটনা, কিন্তু এরই মধ্যে, সকলের অলক্ষ্যে ভালোবাসার সূচনা দেখা দেয়—পরস্পরের দুর্বার আকর্ষণ গভীর প্রেমে পরিণত হয়।

প্রেমের এমনি বিচিত্র ধারা। সে কোন কিছুরই ধার ধারে না—কোন বাছবিচারই নেই তার—সমস্ত যুক্তি-তর্কই তার কাছে উপেক্ষিত। তাই মিসেস্ ফুলামের মত বিদুষী, সুন্দরী, রুচিস্মিতা মহিলাও একদিন ক্লার্কের মত অতি নীচ স্বভাবের মানুষকেই তাঁর সর্বস্ব বলে স্বীকার করে নিলেন,—তার কামনার হোমানলে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে।

এই সময়ে ক্লার্ককে হঠাৎ একবার অফিসের কাজে আগ্রায় বদলি হতে হয়। প্রেমের প্রারম্ভেই এই বিচ্ছেদ উভয়ের কষ্টকর হলেও, ব্যবধান তাঁদের মিলন-বাসনাকে আরও উদ্দাম ও উগ্রতর করে তোলে। প্রেমের দুর্দমনীয় গতি পথ খুঁজে পায় পত্রের ভেতর দিয়ে। দিনের পর দিন বিরহ-বেদনার কথা, উদগ্র আকাঙ্ক্ষার কথা, প্রকাশ পেতে থাকে পত্রের সাহায্যে—পরস্পরকে একান্তে নিরবচ্ছিন্নভাবে পাবার কথা নিয়ে অবৈধ প্রেমের গতি চিঠিপত্রের সাহায্যে বেড়েই চলে ক্রমাগত।

প্রতিদিনই চিঠি লেখেন মিসেস্ ফ্লাম। কেবলমাত্র শনিবার ও রবিবারটি বাদ যায় বাড়িতে স্বামীর উপস্থিতির জন্য। ক্লার্কও নিয়মিত প্রতিটি পত্রের উত্তর দেন এবং সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার মীরাটে এসে গোপনে আগাথা ফ্লামের সঙ্গে দেখা করে যান।

এই সময়কার শত-সহস্র পত্রের মধ্যে প্রায় চারশ' চিঠি বিচারকের হস্তগত হয়, এবং এই প্রেমপত্রগুলিই শেষ পর্যন্ত তাঁদের ষড়যন্ত্র ও হত্যা-কাণ্ডের প্রধান সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায়। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস! যে পত্রগুলি একদিন তাঁদের প্রগাঢ় প্রণয়ের সহায়ক হয়েছিল, সেইগুলিই শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় জীবনান্তের প্রধান কারণ। প্রেমপত্র জমিয়ে রাখার অভ্যাস যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে, ক্লার্ক-ফ্লাম হত্যাকাণ্ডের বিচারের পূর্বে এমনভাবে বোধ হয় আর প্রমাণিত হয়নি। যেন এক অদৃশ্যশক্তির অভিশাপ ছিল এই চিঠিগুলির উপর। এগুলি কেন যে নষ্ট করা হয়নি তারও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই পত্রগুলিই ধীরে ধীরে এই রোমাঞ্চকর হত্যা-রহস্যের সমস্ত গোপনীয় তথ্য উদ্ঘাটন ক'রে বিচার ও শাস্তির সহজ পথ নির্দেশ করে। যে চিঠিগুলি পুলিসের হস্তগত হয়, সেগুলি সবই ক্লার্কের কাছে মিসেস্ ফ্লামের লেখা। ক্লার্কের লেখা কোন চিঠি পাওয়া যায়নি। মিসেস্ ফ্লামকে ক্লার্ক যে চিঠিগুলি লিখতেন, সেগুলির শিরোনাম দেওয়া থাকত: 'মিসেস্ ক্লার্কসন' (Mrs. Clarkson), এবং এই চিঠিগুলি মিসেস্ ফ্লাম পোষ্ট অফিস থেকে নিজেই 'ডেলিভারি' নিয়ে আসতেন।

এই সব পত্রের ভিতর দিয়ে এক দিকে তাঁরা যেমন অবৈধ প্রেমের অতলে নিজেদের ডুবিয়ে দিতে থাকেন, অন্য দিকে তেমনি মিলন-পথের বাধা-বিঘ্ন দূর করার জন্য পৈশাচিক ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত হন গোপনে

গোপনে। মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, ন্যায় ধর্ম সব-কিছুই আচ্ছন্ন হয়ে যায় তাদের হীন আকাঙ্ক্ষার পাপ-প্রভাবে।

এই সময়কার একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে, তাঁদের এই অবৈধ ঘনিষ্ঠতায় মিসেস্ ফুলাম অন্তঃসত্ত্বা হন। এই চিঠিতে মিসেস্ ফুলাম লেখেন :

"প্রিয়তম হ্যারি,

আমার সব চেয়ে বড় ভীতি আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে এবং আমি যে আবার ধরা পড়েছি সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। গত দু'দিন বিকাল থেকেই অত্যন্ত অসুস্থ বোধ কচ্ছিলাম, গত কাল বিকালে হঠাৎ খানিকটা বমি হয়ে গেল। এ ব্যাপারে 'এডি' (স্বামী) খুবই হাসতে লাগল এবং বললে যে, 'আমার মনে হয় এবার তুমি পুরোপুরোই অন্তঃসত্ত্বা হয়েছ।' অতএব প্রিয়তম, এ বিষয়ে আর কোন ভুল নেই। অনেক কষ্ট ও যুদ্ধ করেছি আমরা এই আশঙ্কার বিরুদ্ধে, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করতে পারি না এবং তা করতেও চাই না। বিনা অভিযোগেই এ-ভার আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে।"...

কিন্তু শীগ্গিরই তাঁর এই ভীতির উপশম হয়। ওষুধের সাহায্যে ক্লার্ক মিসেস্ ফুলামকে তাঁর এই ভার থেকে মুক্ত করে দেন।

ইতোমধ্যে লেঃ ক্লার্ককে আবার বদ্লি হতে হয় অন্যত্র। কিন্তু তাঁদের চিঠিপত্রের লেন-দেন এবং নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ চলতেই থাকে। ঠিক সেই সময় মিঃ ফুলামের চোখে সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত বিসদৃশভাবে ধরা পড়ে। মিসেস্ ফুলাম ও ক্লার্কের মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠতা ও আরো নানা খুঁটিনাটি কারণে তাঁর মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। কিন্তু সুচতুরা মিসেস্ ফুলামও স্বামীর মনোভাব সহজেই বুঝতে পারেন, এবং ক্লার্ককে একখানি চিঠি লিখে এ বিষয় সতর্ক করে দেন। চিঠিখানি হচ্ছে :

"ডার্লিং আমার,

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার স্বামী আজ ভোর পাঁচটার সময় আমার শোবার ঘরে তোমার সঙ্গে কথা বলছি দেখে ভীষণ রেগে গিয়েছে। তোমার সঙ্গে চুপিচুপি কথা বলা ছাড়া অবশ্য আর কিছুই দেখতে পায়নি। নাইট গাউন পরে আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, এতে সে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেছে। এর পর থেকে আমাদের খুব সাবধান হয়ে চলতে হবে। আমার সঙ্গে আর দেখা না করে আগ্রায় চলে গেলেই ভালো হ'ত। প্রিয়তম হ্যারি, আমরা দু'জনে পরস্পরকে এতো ভালোবাসি, তবু হায়! এই রকম বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে, নিয়ত যুদ্ধ করা যে কতো কঠিন তা তুমি বুঝবে! ভগবান আমাদের সাহায্য করুন। তোমার জন্যে আমার খুব দুঃখু হচ্ছে—যদি সামর্থ্য থাকত সমস্ত প্রাণ দিয়ে আমি তোমাকে সাহায্য করতাম। কিন্তু আমি একেবারে শক্তিহীনা। তুমি আমার সব চেয়ে ভালোবাসার জিনিস; আমার একান্ত অনুরোধ, আমার জন্যে আর কিছু দিন অপেক্ষা করো—তারপর আমি তোমার কাছে একেবারে মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে ধরা দেব।"....

এই সব কথা শোনার পর থেকে ক্লার্কের মনে নানা দুরভিসন্ধি জাগতে থাকে। তাদের মাঝখানে, অবাধ মেলামেশার অন্তরায় মিঃ ফুলামকে চিরতরে সরিয়ে, শ্রীমতী ফুলামকে সম্পূর্ণভাবে পাবার জন্য ক্লার্ক বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠেন।

সেদিন ২০এ ফেব্রুয়ারী—এই বীভৎস ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। ক্লার্ক যেমন নিয়মিত আসেন, তেমনি সেদিনও মিসেস্ ফুলামের সঙ্গে দেখা করতে আসেন মীরাটে। এবং সেই দিনই ক্লার্ক প্রথম মিসেস্

ফুলামের কাছে তাঁর স্বামীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের কথা উত্থাপন করেন। ঠিক হয়, আরসেনিক (সেঁকো) বিষের সাহায্যে আস্তে আস্তে মিঃ ফুলামকে হত্যা করা হবে এবং এই বিষ ক্লার্ক আগ্রা থেকে মিসেস্ ফুলামকে পাঠাবেন। এই বিষের প্রক্রিয়া এতই মন্থর হবে যে, মিঃ ফুলামের মৃত্যুর জন্য কখনো কেউ কোন সন্দেহের অবকাশই পাবে না।

মিসেস্ ফুলাম এই বিষটিকে (Arsenic) 'টনিক' নামে অভিহিত করতেন এবং তাঁর স্বামীর শরীরে কি ভাবে এই মারাত্মক বস্তুটি ক্রিয়া করে চলেছে তার নিখুঁত বিবরণ ক্লার্ককে নিয়মিত লিখে পাঠাতেন। এই সম্পর্কে তাঁর কয়েকখানি চিঠির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হ'ল :

"প্রাণ-প্রতিম,

আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তোমার এই 'পাউডার' আমি মোটেই অনুমোদন করি না। এ ভাবে আর কত শত বছর কাটবে! এবং এর জন্যে সারাক্ষণ আমরা কি ভীষণ সংশয়ের ভেতর দিয়ে দিন কাটাচ্ছি তা একবার ভেবে দেখ!...

"আমার সর্বস্ব হ্যারি, তুমি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ—ভালো করে একবার ভেবে এমন একটা উপায় স্থির করো, যাতে শীগ্‌গিরই আমরা আমাদের চির-আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে পারি। কোন ছোট পার্শ্বেল যদি আমার নামে পাঠাও, তা'হলে তা রেজিষ্ট্রী করে পাঠিয়ো।"...

এই ধরনের চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের মধ্যেও ক্লার্কের আসা-যাওয়া কিন্তু বন্ধ ছিল না। তিনি প্রায়ই আগ্রা থেকে মীরাটে আসতেন, এবং নিজের হাতেই 'টনিক'টি গোপনে মিসেস্ ফুলামের হাতে দিয়ে যেতেন। এইভাবে ঘৃণিত অপরাধের পর অপরাধ করে চলেন লেঃ ক্লার্ক এবং

তাঁকে উৎসাহিত হয়ে সাহায্য ক'রে চলেন মিসেস্ ফুলাম দিনের পর দিন। মিসেস্ ফুলামের একটি প্রেমপত্র থেকে সেই সময় একদিন ক্লার্কের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। শ্রীমতী ফুলাম লিখছেন :

"ডারলিং,

সেদিনকার সেই আবছায়ার মধ্যে দীর্ঘ মোটার-বিহার, সাভার্স লেনে বেড়ানো—দু'জনে একসঙ্গে সেই আনন্দময় দিনটার মধ্যে ডুবে যেতে তোমার কতখানি ভালো লেগেছিল বল তো? সেই ঘণ্টা-গুলো যেন সুখ-শান্তির সর্বাঙ্গসুন্দর জমাট একটি নিখুঁত স্বপ্ন! আমি ব্যাকুল আগ্রহে আবার সেই স্বপ্নের মধ্যে নিজেকে হারাবার জন্যে অপেক্ষা করছি!"...

এমনি গোপন চিঠিপত্র, দেখা-সাক্ষাৎ ও প্রেমের তন্ময়তার মধ্যে দিয়ে আরো একটি বছর কেটে যায়—আসে ১৯১১ সাল। ইতোমধ্যে তিলে তিলে মিঃ ফুলামকে হত্যা করার যে হীন চক্রান্ত আরম্ভ হয়েছিল, তার ফল ফলতে আরম্ভ হয়। ২১এ জুন প্রথম দেখা দেয় সেই বিষের প্রক্রিয়া। মিঃ ফুলাম অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কলেরার নানা উপসর্গ প্রকাশ পায় তাঁর শরীরে। বাধ্য হয়ে সেই সময় দশ দিনের ছুটি নিয়ে তিনি মুসৌরীতে বায়ু-পরিবর্তনে যান। কিন্তু কপাল যার ভেঙেছে—বিধাতা যার ললাটে আগে থেকেই দুর্গতির লিপি লিখে রেখেছেন, স্থান-পরিবর্তনে তার আর কি উন্নতি হবে!

মিঃ ফুলামের এই ক'দিনের অনুপস্থিতিতে ক্লার্কের যথেষ্ট সুযোগ জুটে যায়। মীরাটে এসে তিনি যেন স্বর্গরাজ্য হাতে পান। প্রেমের উচ্ছৃঙ্খল প্রবাহ সভ্যতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করে, পরস্পরকে নিবিড়ভাবে উপভোগ করতে থাকেন তাঁরা। কিন্তু ফুলাম বেঁচে

থাকতে এই প্রেমলীলা আর কত দিন নিঃসংশয়ে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব! তাই এরই সঙ্গে আবার তাঁরা তাঁকে হত্যা করার নূতন পরিকল্পনা উদ্ভাবন করতে প্রবৃত্ত হন। আরসেনিক খাওয়ানো হচ্ছিল প্রায় আড়াই মাস ধরে এবং ইতোমধ্যে বিষের প্রতিক্রিয়াও আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু প্রেমের উন্মত্ত গতির কাছে বিষের এই মন্থর গতি অসহ্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রেমিক-প্রেমিকা উভয়েই অধৈর্য হয়ে ওঠেন, হত্যাকাণ্ডের শেষ দৃশ্যের জন্য—কামনার উত্তেজনায় তাঁদের মন আরও নৃশংস হয়। অল্প অল্প করে বিষ দেওয়ার পরিবর্তে এক দিনেই তাঁরা সমস্ত শেষ করে দিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হন। ঠিক হয়, আরসেনিকের পরিবর্তে Heat-strokeএর তীব্র ওষুধ খাইয়ে দু'এক দিনেই তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। মীরাটের মত উষ্ণপ্রধান স্থানে Heat-strokeএ মৃত্যু হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়, আর এতে সন্দেহেরও কারু কোন কারণ থাকবে না।

ইদানীং মিঃ ফুলাম স্ত্রীর এই ব্যভিচারে খুবই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে ক্লার্কের সঙ্গে মিসেস্ ফুলামের মেলা-মেশায় যথেষ্ট বিরক্তও হয়েছিলেন। এমন কি, ক্রমশঃ স্ত্রীর প্রতি তিনি এতই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন যে, অনেক সময় তাঁর হাতের রান্না পর্যন্ত খেতেও তিনি ঘৃণা বোধ করতেন। এটা কিছুই অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু তবুও, এ কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে, তারা তাঁকে হত্যা করার জন্য স্থিরচিত্তে এমন এক হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারে। এটা সত্যিই মিঃ ফুলামের কাছে স্বপ্নাতীত ছিল। কিন্তু এই প্রেম-প্রমত্ত ব্যভিচারিণী স্ত্রী স্বামী-হত্যার জন্য কি ভাবে যে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল, তাঁর সামান্য পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নলিখিত আর একখানি চিঠির অংশ থেকে। সেই চিঠিতে মিসেস্ ফুলাম লিখছেন:

"প্রিয় হ্যারি,

পরের চিঠিতে অতি অবশ্যই জানাবে যে, সর্দিগর্মীর (Heat-stroke) মৃত্যুতে কি মুখের আকৃতি ও রঙ কালো হয়ে যায়? এর মৃত্যু কি খুবই কষ্টকর, না এতে মানুষ শীগ্‌গিরই অজ্ঞান হয়ে পড়ে?"...

এমনি সব পরিণতির মধ্যে যতই দিন যেতে থাকে, ততই আরো উদ্দাম হয়ে ওঠে মিসেস্ ফুলামের প্রেম। তার সমস্ত চিঠিগুলির মধ্যেই লেলিহান লালসার চিহ্ন—প্রেমাস্পদের কাছে নিজেকে নিবেদন করার নানা রঙ-ঢঙ ও ভাষায় পরিপূর্ণ।

তাঁর এই সময়কার আর একখানি চিঠিতে স্বামী-হত্যার দুর্দমনীয় কামনার কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। এই চিঠিতে মিসেস্ ফুলাম লিখেছেন:

"প্রাণপ্রিয়,

আমি মন স্থির করে ফেলেছি। এই বৃহস্পতিবার ২৭এ খাবার সময় সেই তরল পদার্থটি নিশ্চয়ই ওকে খাওয়াব। পাচককে আমি ভালো করে মুর্গীর ঝোল রাঁধতে বলেছি। এই ঝোলে লেবুর রস মিশিয়ে ভাতের সঙ্গে খাওয়ানো হবে। লেবুর রস মেশানো টক ঝোলে, তেতো বিষের কোন স্বাদ পাওয়া যাবে না এবং এতে সন্দেহেরও কোন কারণ থাকবে না। তাছাড়া প্রিয়তম, বৃহস্পতিবার দুপুরে আমরা তোমার সেই পুরনো হাসপাতালের সামনে Berkshire Sports দেখতে যাব। একে এই ভীষণ দুপুরের আবহাওয়া, তার উপর কোথাও এক ফোঁটা বৃষ্টির চিহ্নমাত্র নেই—কাজেই, এহেন সময়ে রোদ লেগে যাওয়াটা কিছুই অবিশ্বাস্য নয়। সুতরাং বৃহস্পতিবারই বোধ হয় আমাদের

এই ভীষণ কাজটির পরিসমাপ্তির শেষ দিন। তোমারও কি তাই মনে হয় না প্রিয়তম ?”…

তারপর সত্য সত্যই চিঠির উল্লিখিত ভয়াবহ তথ্য অনুযায়ী কাজ হয়। দ্বিচারিণী ফুলাম-পত্নী স্পোর্টস্ দেখে ফেরার পর, ২৭এ জুলাই রাত্রে খাবার সময় এক ডিস্ সুপের সঙ্গে ‘হীট্ ষ্ট্রোকের’ ওষুধটি মিঃ ফুলামকে খাইয়ে দেন। খাওয়ার অব্যবহিত পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু এই অসুস্থতার মধ্যে যে কারো কোন ষড়যন্ত্র থাকতে পারে তা কেউই সন্দেহ করে না, কারণ ডাক্তাররাও মিঃ ফুলামের অসুস্থতাকে Heat-strokeএর আক্রমণ বলে সিদ্ধান্ত করেন।

সে-যাত্রা মিঃ ফুলাম কোন রকমে সামলে উঠলেও, কিছু দিন পরে আবার তাঁকে খাওয়ানো হয় এই ভীষণ কালকূট এবং পুনরায় তাঁকে হাস-পাতালে পাঠানো হয় চিকিৎসার জন্য। এবারের আক্রমণ কিন্তু মিঃ ফুলামকে একেবারে অকেজো করে দেয়, তিনি হাসপাতাল থেকে ফিরে আসেন সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে। ২রা সেপ্টেম্বর মেডিক্যাল বোর্ড তাঁকে চাকরির সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করেন এবং তাঁর পক্ষে বর্তমানে অবসর গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই বলতেও তাঁরা দ্বিধা করেন না।

এই ভাবে বার বার মারাত্মক বিষের আক্রমণে আক্রান্ত হয়ে, অসুস্থতায় ও জীবন সম্বন্ধে হতাশায় প্রথম দিকে মিঃ ফুলাম সপরিবারে বিলেতেই ফিরে যাবেন বলে স্থির হয়, কিন্তু পরে উক্ত মত পরিবর্তন করে ভারতবর্ষে থাকাই তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন। এবং ভাগ্যচক্রে শেষ পর্যন্ত আগ্রায় গিয়ে বসবাসেরই ব্যবস্থা হয়। এই স্থান নির্বাচনের মধ্যে মিসেস্ ফুলামের কতখানি প্রভাব ছিল তা জানা যায় না।

এর পর আমাদের ঘটনার পট-পরিবর্তিত হয় আগ্রায়। ১৯১১ সালের ৮ই অক্টোবর ফুলাম আগ্রায় পৌছান, এবং তার দু'দিন পরেই অর্থাৎ ১০ই অক্টোবর রাত্রেই বহির্বাটীর বারান্দায় খাবার সময় তৃতীয়বার আবার তাঁকে হীট্-ষ্ট্রোকের সেই ওষুধটি খাওয়ানো হয়। মিসেস্ ফুলাম নিজের হাতে স্বামীর থালায় মাংস ও ঝোলের সঙ্গে সেই বিষ মিশিয়ে পরিবেশন করেন। ঐ মারাত্মক ঝোল গলাধঃকরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ ফুলাম অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। একে আগে থেকেই শারীরিক অবস্থা তাঁর খারাপ হয়েছিল, তার উপর আবার এই বিষ শরীরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বমি করতে আরম্ভ করেন। সেদিন ক্লার্ক সেখানে সান্ধ্য-ভোজের অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ওষুধের অছিলায় তিনি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেন। হাইপোডারমিক সিরিঞ্জের সাহায্যে সেই অবস্থার উপরেই ক্লার্ক ফুলামের শরীরে আরো বিষ ইন্‌জেক্‌সন করে দেন। বিষে বিষে জর্জরিত শরীরের পক্ষে তা আর সহ্য করা সম্ভব হয় না—মিঃ ফুলাম তৎক্ষণাৎ শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন —এই নৃশংস ষড়যন্ত্রের হাত থেকে চিরতরে তিনি রেহাই পান। মিসেস্ ফুলাম ও ক্লার্কের এত দিনের দুরভিসন্ধি সফল হয়। সে দিনটা ছিল ১০ই অক্টোবর, তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হয় তার পরের দিন, এবং কোন কিছু ধরা পড়া বা সন্দেহ করার মত কোন কারণও ঘটে না।

এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের একমাত্র সাক্ষী ছিল মিঃ ফুলামের দশ বৎসর বয়স্কা কন্যা ক্যাথলীন। কিন্তু মার জন্য তার কণ্ঠ নীরব হয়েই থাকে।

মিসেস্ ফুলাম আজ বহু দিন পরে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করেন। অনেক দুর্ভাবনা আজ দূর হয়ে গেছে তাঁর মন থেকে। তাঁর এবং ক্লার্কের মাঝখানের একটা বড় বাধা এতো দিন পরে তিনি কাটিয়ে

উঠতে পেরেছেন। সকল দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে, সেই অনাগত অসীম সুখ-সাগরে নিজেকে তলিয়ে দেবার দিনটির জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন—অপেক্ষা করতে থাকেন, কবে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ক্লার্কের স্ত্রী-রূপে ঘোষণা করতে পারবেন, সেই শুভদিনটির জন্য। তাঁর সেই সময়কার আর একটি চিঠি থেকে এই কামনার গুরুত্ব ভালোভাবেই উপলব্ধি করা যায়:

"আমার মিষ্টিমণি,

কি অপরিসীম আনন্দেই কেটেছে গত-দিনের রাত্রি—বিদায়-ক্ষণে আমায় 'হৃদয়েশ্বরী' বলে তোমার সেই সম্ভাষণ, 'অমূল্য প্রিয়া আমার' বলা,—তারপর সারা রাত্রি কি সুখ ও শান্তিতে কাটিয়েছি আর অনুভব করেছি যে, জগতে সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসে আমাকে আমার হ্যারি। আর কেউই আমাকে এমন করে ভালোবাসেনি—এত সহজ, সত্য ও গভীরভাবে। প্রিয়তম, এ যে কি—এমনি একজন শক্তিমান পুরুষের উজাড়-করা ভালোবাসা পাওয়া যে হীরা-মাণিকের চেয়েও কত মূল্যবান তা আমি মনে-প্রাণে অনুভব করছি।"...

আর একখানি চিঠিতে মিসেস্ ফুলাম ক্লার্ককে লেখেন:

"প্রিয় আমার,

সুখ-শান্তির চরম ক্ষণটি এখনো আসেনি আমাদের জীবনে। এখন কেবল একান্ত-চিত্তে আশা ও প্রার্থনা করছি যে, এই চরম মুহূর্তটি যেন আমাদের আনন্দ-মিলনের, দীর্ঘ-বিবাহিত জীবনের, তোমার চিরসাথী হয়ে থাকার দিন হয়ে, আর পিছিয়ে না যায়। আমি নিশ্চিত জানি যে আমাদের বিবাহিত জীবন হবে অত্যন্ত সুখের, কারণ আমাদের এ-বিবাহ সত্যিকারের ভালোবাসার বিবাহ—তাই নয় কি, প্রিয়তম?"...

মিঃ ফুলামের মৃত্যুতে, এক দিকের পথ পরিষ্কার হলেও, অপর দিকে তখনও ছিলেন মিসেস্ ক্লার্ক—লেঃ ক্লার্কের পত্নী। তিনিই তখন এই প্রেমিক-প্রেমিকার চির-মিলন-পথের একমাত্র বাধাস্বরূপ হয়ে দেখা দিলেন। মিসেস্ ফুলাম এ-কথা ভালোভাবেই জানতেন যে, ঐ সৎচরিত্রা, শান্তিপ্রিয়, নীরব মানুষটি বেঁচে থাকতে ক্লার্কের সঙ্গে তাঁর বিবাহের কোন উপায় নেই।

ক্লার্কের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কের কথা পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি। কোন স্ত্রীর পক্ষে স্বামীগৃহে এরূপ যন্ত্রণাদায়ক দুঃখের জীবন কল্পনাতীত হলেও, মিসেস্ ক্লার্ক সকল নির্যাতন অদ্ভুত দার্শনিক মনোভাবের সঙ্গে চিরদিনই মুখ বুজে সহ্য করে এসেছেন। ক্লার্ক বহুবার তাঁকে বিষ খাইয়ে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও করেছিলেন, এবং তাঁর এ-সব কাজের বহু প্রমাণও পাওয়া যায়। বিশেষভাবে দু'বার ক্লার্কের হাসপাতালের চাকর ও তাঁদের বাড়ির খানসামা বুদ্ধুর সাহায্যে খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়। মিসেস্ ক্লার্ক দু'বারই অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন বটে, কিন্তু মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পান। এর পর এইভাবে বিষপ্রয়োগে অকৃতকার্য হয়ে, মিঃ ক্লার্ক স্ত্রীকে অন্যভাবে বলপ্রয়োগে হত্যা করার উপায় নির্ধারণ করতে থাকেন। কিন্তু মিসেস্ ক্লার্ক স্বামীর এই সব ঘৃণ্য কার্যকলাপ বা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন বলে, নিজের খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে সকল সময়েই খুব সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এবং সে জন্য ক্লার্কও চাকরদের টাকা দিয়ে বিষ খাইয়ে, নানাভাবে স্ত্রীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেও এ যাবৎ কৃতকার্য হতে পারেন নি। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও কোন দিন মিসেস্ ক্লার্ক স্বামী-ত্যাগ বা বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা করার জন্য কোনরূপ উৎসাহ দেখান নি।

ক্লার্ক-ফুলাম হত্যা রহস্য

এদিকে মিসেস্ ফুলাম অত্যন্ত অধৈর্য হয়ে ওঠেন ক্লার্ককে বিবাহ করার জন্য। তাঁর আর একখানি চিঠির কয়েকটি লাইনে এই মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয় মেলে :

…"আমাদের এই দু'টি প্রেমোৎসগিত হৃদয়, ভগবানের রাজ্যে সব চেয়ে যা মধুর সেই বিবাহ-বন্ধনের ভেতর দিয়ে যেন আরও ভালোবাসায় ও আরও মধুরতর বন্ধনে পরস্পরের নিকটতর হয়।"…

ক্রমশঃ এই সব চিঠির প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় বীভৎসভাবে। মিসেস্ ক্লার্ককে হত্যা করার ষড়যন্ত্র আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। বিষ খাইয়ে হত্যার চেষ্টায় অকৃতকার্য হয়ে, মিঃ ক্লার্ক তাঁর স্ত্রীকে সুনিশ্চিত হত্যা করার ঘৃণিত পথ অবলম্বন করেন।

এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাঁচটি লোকের নাম পাওয়া যায়। (১) বুদ্ধু, ক্লার্কের ভূতপূর্ব চাকর। ক্লার্কের প্ররোচনায় দু'বার সে মিসেস্ ক্লার্ককে বিষ খাওয়াতে গিয়েছিল। (২) বুদ্ধা (৩) সুখ্‌খা (৪) মোহন ও (৫) রামলাল। খুনে গুণ্ডা বলেই এদের পরিচয় ছিল শহরের মধ্যে। ক্লার্কের সঙ্গে এদের এক চুক্তি হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী স্থির হয় যে, এরা ডাকাতির ভান করে মিসেস্ ক্লার্কের বাংলোয় ঢুকে তাঁকে খুন করবে এবং কৃতকার্য হলে পুরস্কারস্বরূপ এক শত টাকা পাবে। ধরা পড়ার পর বুদ্ধার স্বীকারোক্তিতে এই একশ' টাকা পুরস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এ-ও প্রমাণ হয় যে, এই সময় মিসেস্ ফুলামের দেওয়া একখানি একশ' টাকার চেকও ভাঙানো হয়।

১৯১২ সালের ১৭ই নভেম্বর এই লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হয়। রাত্রের দিকে দুর্বৃত্তরা গোপনে মিসেস্ ক্লার্কের বাংলোয় প্রবেশ করে। সে দিনটা ছিল রবিবার; ক্লার্ক তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অছিলায়,

অর্থাৎ ঘটনাকালে নিজেকে স্থানান্তরে রেখে নির্দ্দোষ (alibi) প্রমাণ করার জন্য, রাত্রি ১২-৪৫ মিনিট পর্যন্ত রেল-ষ্টেশনে কাটিয়ে বাড়ি ফেরেন। ক্লার্ক এটা নিশ্চিত জানতেন যে, বাড়ি ফিরেই তিনি সব শেষ হয়ে গেছে দেখবেন, এবং তাঁর স্ত্রীর হত্যাকাণ্ড ও তৎসংক্রান্ত ব্যাপার নিয়েই হইচই হচ্ছে শুনবেন। কিন্তু ফিরে এসে তিনি দেখেন যে, যা ঘটা উচিত ছিল তা কিছুই ঘটেনি। বাড়ির পোষা কুকুরের চীৎকারে ভাড়া-করা হত্যাকারীরা তাদের গোপন স্থান থেকে বেরুতে পারেনি। এ ব্যাপার চাক্ষুষ দেখার পর প্রভু নিজেই কুকুরটিকে তাঁর নিজের একটি বিছানার চাদরে মুড়ে বেঁধে বহির্বাটীর একটি ঘরে বন্ধ করে রাখেন।

ক্রমশঃ রাত্রি আরো গভীর হয়, কুকুরের বিরক্তকর আওয়াজ তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। প্রায় দেড়টা নাগাদ আস্তে আস্তে সয়তানরা প্রবেশ করে মিসেস্ ক্লার্কের ঘরে। তারপর তারা ঐ অসহায়া নারীকে ঘুমন্ত অবস্থায় তরবারির সাহায্যে মাথায় ও শরীরের নানা স্থানে আঘাত ক'রে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ডাকাতির উদ্দেশে খুন হয়েছে, ব্যাপারটাকে এই ধরনের রূপ দেবার জন্য হত্যাকারীরা ঘরের আসবাবপত্র ছইছত্রাকার করে যায় বটে, কিন্তু ডাকাতি হিসাবে নিজেদের জন্য কিছুই তারা নিয়ে যায় না এবং মিসেস্ ক্লার্কের পাশে ঘুমন্ত ছোট ছেলেটিকেও তারা স্পর্শ করে না।

হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই পুলিসে খবর দেওয়া হয় এবং পুলিস তৎক্ষণাৎ তদন্তের ভার নেয়। কিন্তু এই ঘটনার বহু পূর্বে থেকেই ক্লার্কের সঙ্গে মিসেস্ ফুলামের অবৈধ ঘনিষ্ঠতার কথা আগ্রায় প্রায় সকলেই অল্প-বিস্তর জেনে গিয়েছিল, এবং তাঁর সঙ্গে মিসেস্ ক্লার্কের অশান্তিকর সম্পর্কও কারো জানতে বাকী ছিল না। কাজেই পুলিসও খুব সহজে হত্যাকাণ্ডটিকে

নিছক ডাকাতি বলে গ্রহণ করতে পারেনি। এ ছাড়া আরো অনেক ব্যাপারে পুলিসের সন্দেহের উদ্রেক হয়। প্রথমতঃ, ঘটনাকালে কুকুরের চীৎকার শুনতে পাওয়া যায় না, এবং সেই রাত্রেই ক্লার্কের বিছানার চাদর অন্তর্ধান হওয়ার ব্যাপারও পুলিসের নজর এড়ায় না। দ্বিতীয়তঃ, দুর্বৃত্তদের কিছু না নিয়েই বিদায় হওয়াটা বিশেষ সন্দেহের উদ্রেক করে। তৃতীয়তঃ, ক্লার্ক পুলিসের কাছে তাঁর জবাবদিহিতে একটি মারাত্মক ভুল করেন। তিনি বলেন যে, ঘটনাকালে তিনি দিল্লি থেকে বোম্বাই যাত্রী এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য রেল-ষ্টেশনে যান। কিন্তু এ-কথা যে কতদূর মিথ্যা পরে তা প্রমাণিত হয়। দিল্লি থেকে বোম্বাই যাওয়ার কোন ট্রেন আগ্রার লাইনে যে পড়ে না, সে-কথা তখন তাঁর খেয়ালই হয়নি।

এত দিন পরে দুষ্কৃতির ফল ফলতে স্বরু হয়। ১৪ই নভেম্বর তদন্ত-শেষে পুলিস ক্লার্ককে গ্রেপ্তার করে। তারপরেই পুলিস মিসেস্ ফুলামের বাংলোয় যায় খানাতল্লাসীর জন্য। এই সময় মিসেস্ ফুলামের বিছানার তলা থেকে একটি টিনের বাক্সের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত চার শত প্রেমপত্র পুলিসের হস্তগত হয়।

ক্লার্কের বাংলো খানাতল্লাসী হওয়ার সম্ভাবনায়, ধরা পড়ার ভয়েই বোধ হয় এই চিঠিগুলি মিসেস্ ফুলামের কাছে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল।

এই অপ্রত্যাশিত প্রেমপত্রগুলিই শেষ পর্যন্ত যেন নিদারুণ নির্মমতায় প্রেমিক-প্রেমিকার অতি নীচ প্রেমধারার প্রতিটি দিনের, প্রতিটি কাজের, প্রতিটি পাপের নিখুঁত বর্ণনা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও প্রত্যক্ষভাবে জগতের সামনে এবং বিচারকদের সম্মুখে দু'টি হত্যাকাণ্ডেরই সম্পূর্ণ রহস্য উদ্-ঘাটিত করে। এই চিঠিগুলি এমনভাবে রক্ষা করার মধ্যে ক্লার্কের যে

কি অভিসন্ধি ছিল তা সত্যিই বোধগম্য হয় না। এই চাক্ষুষ প্রমাণগুলি সরিয়ে ফেলতে পারলে হয়ত তিনি বেঁচে যেতে পারতেন। কিন্তু তা হবার নয়, তাই শেষ পর্যন্ত এই চিঠিগুলিই যেন সযত্নে রক্ষিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পথকে সুগম করে দেবার জন্য।

১৯১৩ সালের ২৭এ ফেব্রুয়ারী ক্লার্ক এবং মিসেস্ ফুলামের মামলার শুনানি আরম্ভ হয়, এবং মাত্র তিন দিনেই বিচার শেষ হয়ে যায়। এই মামলায় দু'জনকেই দু'টি অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগে মিঃ ফুলামকে এপ্রিল মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত হত্যা করার প্রচেষ্টায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়, এবং দ্বিতীয় অভি-যোগে ১০ই অক্টোবর মিঃ ফুলামকে হত্যা করার অপরাধে অপরাধী বলে ঘোষণা করা হয়। আসামীদের বিরুদ্ধে সকল প্রমাণ বিচারালয়ে উপস্থিত করার পর, ক্লার্ক নিজে তাঁর সমস্ত অপরাধ স্বীকার করেন এবং তাঁর জবাবদিহিতে বলেন যে, একমাত্র আমিই সব-কিছু অপরাধের জন্য সম্পূর্ণ-ভাবে দোষী। মিসেস্ ফুলাম আমার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেছেন মাত্র। তাঁর উপর আমার প্রভাব অত্যন্ত বেশি ছিল, সে কারণ তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ আমার আয়ত্তাধীন। তিনি যা করেছেন তার জন্য তাঁকে অপরাধী করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত কিছুর জন্যে একমাত্র আমি নিজেই দায়ী। ধর্মাবতার কি আমাকে প্রথম থেকে সব কথা বলবার অনুমতি দেবেন? —গোড়াতে আমারই অভিপ্রায় ছিল তাঁকে অসুস্থ করে ফেলা, এবং অল্প অল্প বিষ খাইয়ে এমনই রুগ্ন করে ফেলা,—যাতে দীর্ঘ দিনের ছুটিতে তাঁকে দেশের বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়।"...

এই সমস্ত অমানুষিক বীভৎস ঘটনার মধ্যে ক্লার্কের চরিত্রে কেবলমাত্র এই একটি গুণই বিশেষভাবে প্রকাশ পায় যে, শেষ পর্যন্ত তিনি মিসেস্ ফুলামের সমস্ত অপরাধের বোঝা নিজের মাথায় চাপিয়ে নিয়ে তাঁকে রক্ষা করার জন্য—অকৃতকার্য হলেও, তাঁর নির্দোষিতা প্রমাণে যথা-সাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। বিচারালয়ে তিনি শেষ অনুরোধ করেন মিসেস্ ফুলামের সঙ্গে একবার সাক্ষাতের জন্য। কিন্তু অনুমতি তিনি পেলেও, মিসেস্ ফুলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকৃত হন। সে সময় এই যন্ত্রণাদায়ক সাক্ষাৎ অপেক্ষা দেখা না হওয়াই হয়ত শ্রেয়ঃ মনে করেছিলেন মিসেস্ ফুলাম।

আত্মপক্ষ সমর্থনে মিসেস্ ফুলামও যথাসাধ্যভাবে এই কথাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, তিনি তাঁর স্বামীকে কখনোই হত্যা করতে চাননি, তবে তাঁকে চিররুগ্ন করে রাখাই ছিল তাঁর একমাত্র অভিপ্রায়। কিন্তু এ বিষয়ে চিকিৎসকগণের বিরুদ্ধ মতামতের সম্মুখে উভয় আসামীরই উক্ত ধরনের যুক্তিহীন উক্তি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়—প্রমাণিত হয় না।

এইখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মিসেস্ ফুলামের বিরুদ্ধে মামলা আরম্ভ হবার প্রায় এক পক্ষকাল পূর্বে তিনি 'রাজসাক্ষী' হয়ে (King's Evidence) নিজেকে মুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন, এবং এলাহাবাদের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁর আবেদন মহামান্য এলাহাবাদ হাইকোর্টে পাঠিয়ে দেবার জন্য প্রার্থনা জানান। এটা শুধু জেল থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য তিনি একটা বড় রকমের চাল চেলে-ছিলেন মাত্র, কারণ তিনি জানতেন যে, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তাঁর কিছুতেই ফাঁসি হতে পারে না।

মিঃ ক্লার্ক ও মিসেস্ ফুলাম উভয়েই শেষ পর্যন্ত কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ সমভাবে প্রাণদণ্ডাদেশে দণ্ডিত হন।

এই মামলার বিচারকালে যখন মিঃ ফুলামের ছোট মেয়ে ক্যাথলীন সজল অশ্রুপূর্ণ নয়নে তার বক্তব্য বলতে থাকে, তখন বিচারালয়ে এক করুণ মর্মস্পর্শী দৃশ্য দেখা দেয়,—অনেকের পক্ষেই অশ্রু-সংবরণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

ক্যাথলীন বলে,…"বাবা বললেন, ক্যাথলীন আমার, আমি চল্লুম। লক্ষ্মী মেয়েটি হয়ে থেকো, ভগবান তোমায় আশীর্বাদ করবেন। লিও-নার্ডকে আমার ভালোবাসা দিও, আর বলো, সে যেন ক্ষোভ না করে।" তারপর তিনি আরো বললেন, "তোমার মা কোথায়?" উত্তরে আমি বললাম, "খাবার ঘরে আছেন, আমি তাঁকে ডেকে দেব?" বাবা বললেন, "না মণি, তাকে আর আমার প্রয়োজন নেই।"…

এর পর মিসেস্ ক্লার্ককে হত্যার দ্বিতীয় মামলা আরম্ভ হয় ১৯১৩ সালের ১০ই মার্চ এবং এর বিচারও মাত্র তিন দিনে, অর্থাৎ ১৩ই মার্চ শেষ হয়ে যায়। এই মামলায় আসামীর সংখ্যা ছিল সর্বসমেত ছ'জন। বুদ্ধা, রামলাল, সুখ্খা, মোহন এবং মিসেস্ ফুলাম ও মিঃ ক্লার্ক। মিসেস্ ফুলাম ও ক্লার্ক সাহেব অপরাধ স্বীকার করেন। অন্যান্যদের মধ্যে বুদ্ধু অপরাধ স্বীকার করে রাজসাক্ষী হওয়ায় বেঁচে যায়। রামলালের অপরাধ সম্পর্কে সন্দেহ থাকায় তাকেও ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকী সকলকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, এবং মিসেস্ ফুলাম ব্যতীত প্রত্যেকটি আসামীকেই ফাঁসি দেওয়া হয়।

মিসেস্ ফুলাম শেষ পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে পরিত্রাণ পান। কারণ তিনি তখন গর্ভবতী। আইনতঃ গর্ভবতী থাকাকালীন ফাঁসি হয়

না, তা সে সন্তান জারজ হলেও। ইংরেজীতে একেই বলে 'Quick with child'. তবে তিনি এত বড় অপরাধের হাত থেকে একেবারেই মুক্তি পান নি, ফাঁসির পরিবর্তে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

কিন্তু এই কারাদণ্ডও বেশি দিন তাঁকে ভোগ করতে হয়নি। ১৯১৪ সালের মে মাসে এলাহাবাদের নৈনী জেলে একটি শিশু-সন্তান প্রসবের পরই তিনি মারা যান—অবৈধ প্রেমের পরিণতি, নির্মম নৃশংসতার চরম ফল ফলে উভয়েরই মৃত্যুতে।

যৌন-বিশেষজ্ঞরা মানুষের অত্যধিক যৌন-লালসাকে একটা রোগ-বিশেষ বলে স্বীকার করেন। তাঁরা বলেন, কামুক লোক যে অবস্থারই হোক কাণ্ডজ্ঞানহীন হতে বাধ্য। কথাটা মিথ্যে নয়। বিশেষ করে ধনী লোকদের মধ্যে এর প্রকাশ ভয়াবহরূপ ধারণ করে অর্থের প্রাচুর্যে। অর্থের সাহায্যে তাঁরা তাঁদের যথেচ্ছাচারের সুযোগ পান এবং অর্থ দিয়েই আবার নিজেদের কদর্যতা ঢাকেন। কিন্তু তবুও, সেই যে কথায় বলে, 'পাপ চার-পো হলে আপনি ফলে,' তাই টাকায় সব কিছু ঢাকা সম্ভব হয় না—এক দিন তা প্রকাশ পায়ই।

সেদিক থেকে বাওলা হত্যাকাণ্ডকে এর একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলা যায়। এই ঘটনায় অগাধ ঐশ্বর্যের মালিক ইন্দোরের মহারাজা গদি-চ্যুত হন, ভারতীয় রাজন্যবর্গের অনেকেরই কুখ্যাতি নানাভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং বোম্বাইয়ের অন্যতম বিখ্যাত ধনী ও সম্ভ্রান্ত নাগরিক বাওলা মালাবার হিলে আততায়ীর আক্রমণে নিহত হন।

যে স্ত্রীলোককে কেন্দ্র করে এই রোমাঞ্চকর হত্যাকাণ্ড ঘটে, তিনি অমৃতসরের একজন নর্তকী, নাম : মমতাজ বেগম। তাঁরই প্রণয়-লালসার কবলে পড়ে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোককে সুদূরপ্রসারী দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়েছিল, না কয়েকজন যৌন-বিলাসী উচ্ছৃঙ্খল ধনী লোক ইন্দ্রিয়-

সম্ভোগের ইন্ধন হিসাবে তাঁকে এই দুর্ভোগের মধ্যে টেনে এনেছিলেন, এ কথা বলা শক্ত। বুদ্ধিমান পাঠক এর বিচার করবেন। ইন্দোর তাঁকে জানত, বোম্বাইয়ে তাঁর খ্যাতি ছিল এবং হায়দ্রাবাদেও তিনি পরিচিত ছিলেন। কিন্তু মমতাজ বেগমের এই পরিচিতি ১৯২৫ সালের ১২ই জানুয়ারীর পর ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে—প্রেম, হিংসা ও হত্যার ভেতর দিয়ে, সংবাদপত্রের সাহায্যে।

যে-বংশে মমতাজ বেগমের জন্ম হয়, বংশানুক্রমে শতাধিক বর্ষ ধরে সঙ্গীত ও নৃত্যের বেসাতি করাই ছিল তাঁদের পেশা। তাঁর নিজেরও ছিল ঐ পথ, এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি ছিল না বললেই চলে। কাজেই সঙ্গীত ও নৃত্যপটীয়সী এই রূপসী তন্বী বাইজীর লালসার লেলিহান শিখার সান্নিধ্যে কীট-পতঙ্গের মত কামাতুর মানুষরা যে গিয়ে পড়বে, তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে! কিন্তু কমলকলি তার শতদল বিস্তার করতে না করতেই তার উপর অলি এসে পড়েছিল—কুসুমটি ফুটতে না ফুটতেই তুকাজী রাও হোলকার সেটিকে অধিকার করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন এবং ঐশ্বর্যের জোরে দীর্ঘ দশ বছর তাকে কামনা-পরিতৃপ্তির খোরাক হিসাবে ভোগ-দখল করার পর, সে-বস্তু হস্তান্তরিত হয়ে গেলে তাকে পুনরায় করায়ত্ত করার জন্য এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

রূপোপজীবিনীদের নিষ্ঠার বালাই নেই বলেই হয়ত তুকাজী রাওয়ের হাত ফস্‌কে বেগম সাহেবা এক দিন বাওলার কামানলে এসে বারিসিঞ্চন করেন। এই হাত-বদলের মধ্যে অর্থ বা আসক্তি কোন্‌টার প্রভাব বেশি ছিল, তা যদিও জানা যায় না, কিন্তু পরবর্তীকালে আরো অন্যান্য বহু পুরুষের হৃদয়-হরণ করা সম্পর্কে এ কথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, শ্রীমতী মমতাজের আকর্ষণী-শক্তি ছিল খুবই প্রবল।

মমতাজের মা'র নাম ছিল ওয়াজীর বেগম। তৎকালীন একজন নামজাদা গায়িকা হিসাবে তাঁরও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। ১৯২৪ সালের ২৪এ জুন এই ওয়াজীর বেগমই প্রথম বোম্বাইয়ের চীফ কমিশনার অব্ পুলিসের কাছে ইন্দোরের মহারাজা তুকাজী রাও হোলকারের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এক দরখাস্ত করেন। দরখাস্তে বলা হয় যে :

"পেশায় আমি ও আমার কন্যা দু'জনই গায়িকা। ১৯১৭ সালে ইন্দোরের মহারাজা তুকাজী রাও হোলকার নির্দিষ্ট বেতনে আমাদের উভয়কে তাঁর নিজস্ব গায়িকা নিযুক্ত করেন। আমার কন্যার যৌবনের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজা তাকে শয্যা-সঙ্গিনী হিসাবে রাখেন এবং দিবারাত্র আমাদের দু'জনকেই পাহারাধীন রাখা হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মহারাজা বোম্বাই আসেন এবং আমাদেরও ঐখানে এনে নেপিয়ান সী রোডে হোসেনভায়ের বাংলোতে পৃথকভাবে রক্ষী-পরিবেষ্টিত অবস্থায় রাখা হয়। মহারাজা নিজেও সদলবলে তাজমহল হোটেলে অধিষ্ঠান করেন।

"উক্ত বৎসরেরই ২৭এ এপ্রিল মহারাজা তাঁর ম্যানেজার ও অপর কে একজন শঙ্কররাও বাপুরাওয়ের সহায়তায় আমার কন্যাকে রাত্রে ফিরিয়ে দিয়ে যাবার অঙ্গীকারে আমার কাছ থেকে সিনেমায় নিয়ে যান, কিন্তু আমার কাছে ফিরিয়ে না দিয়ে আমার অজ্ঞাতসারে এবং সম্মতি না নিয়েই তাকে ইন্দোরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তখন তার বয়স মাত্র তের বৎসর।

"আমি সেই সময় বোম্বাইয়ের পুলিস কমিশনারের নিকট দরখাস্ত করি। ফলে উক্ত শঙ্কররাও বাপুরাওকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পুলিস অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়। কিন্তু আমার কন্যার জন্ম-তারিখের কোন

নথিপত্র না পাওয়ায় মামলার কাজ বন্ধ থাকে, এবং আমার কন্যাকে মহারাজের অধিকারে ও হেপাজতেই পাহারাধীন থাকতে হয়।

"১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে মহারাজা ইংলণ্ডে গমন করেন এবং আমি জানতে পারি যে, মহারাজার আদেশে আমার কন্যাকে গোপনে বোম্বায়ে এনে চৌপাট্টির এক বাংলোয় রাখা হয়েছে এবং তাকে 'কমলা বাঈ' ছদ্মনামে ইংলণ্ডে নিয়ে যাবার আদেশ দেওয়া হয়েছে, উক্ত শঙ্কররাওয়ের উপর। সেই নামে তার যাবার টিকিটও কেনা হয়েছিল। ৩০এ এপ্রিল, আমি পুলিস কমিশনারের নিকট ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির এক শত ধারা অনুসারে শঙ্কররাও বাপুরাওয়ের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করি। পুলিস কমিশনার বোম্বাইয়ের পুলিস কর্মচারী মিঃ ফুলারের উপর তদন্তের ভার দেন। জাহাজে আমার কন্যার খোঁজ পাওয়া যায়। একজন ইউরোপীয়ান মহিলা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে এই সংবাদ আনেন যে, সে স্বেচ্ছায় ইংলণ্ড যাচ্ছে এবং তাকে যেতে দেওয়া হয়। এই উত্তরের কোন মূল্য ছিল না, কারণ সে সময় আমাকে তার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি এবং আমার সামনেও তাকে কোন প্রশ্ন করা হয়নি।

"প্রায় আড়াই বৎসর পূর্বে আমি মহম্মদ আলী নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করি। এই সময় পর্যন্ত আমার কন্যাকে সম্পূর্ণ বন্দিনী অবস্থায় রাখা হয়েছিল। আমাকে বা আমার কন্যার আত্মীয়দের তার সঙ্গে মোটেই দেখা করতে দেওয়া হয়নি।

"ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের প্রায় এক বৎসর পরে আমার কন্যা গর্ভবতী হয়। গর্ভাবস্থার সপ্তম মাসে তার একান্ত অনুরোধে আমাকে এবং আমার পরিবারের অন্যান্য লোককে ইন্দোরে আমার কন্যার সঙ্গে পাহারাধীনে বাস করার অনুমতি দেওয়া হয়। তারপর যথাসময়ে তার

এক সজীব কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ধাত্রীরা আমাদের জানায় যে, শিশুটি মারা গেছে। এই ঘটনায় আমার কন্যা এতদূর বিচলিত হয় যে, সে রাজপ্রাসাদ ও মহারাজের সান্নিধ্য ত্যাগ করে যেতে মনস্থ করে। কিন্তু পাহারাধীন থাকায় আমাদের দ্বারা মহারাজের রক্ষী-ব্যূহ ভেদ করে আসা মোটেই সম্ভব হয় না।

"১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের কাছাকাছি সময় মহারাজার কাছ থেকে আমরা আদেশ পাই ভানপুরা যাবার। সেখানে তখন তিনি শিকারে গিয়েছিলেন। রাজ-পরিবারের এক কর্মচারী মিঃ সিউলের তত্ত্বাবধানে আমরা সদলবলে আমাদের পাহারা সমেত সেখানে উপস্থিত হই। ইন্দোর ত্যাগ করার সময় কিছু কাপড়চোপড়, তৈজসপত্র ও কয়েকটা সাধারণ অলঙ্কার মাত্র আমরা সঙ্গে নিই, বাকী মূল্যবান যা-কিছু সবই মহারাজার হেপাজতে থাকে। ইন্দোরে ও ভানপুরায় দু'এক দিন আমার কন্যাকে বিমর্ষ দেখে মহারাজা বলেন যে, ইচ্ছে করলে সে এখন ইন্দোর ত্যাগ করে যেতে পারে, কিন্তু সেই মর্মে তিনি কোন আদেশপত্র দেননি। ভানপুরায় কয়েক দিন থাকার পর আমাদের মুসৌরী যেতে আদেশ দেওয়া হয়। সেই সময়ে আমি বোম্বাই ও দিল্লির পুলিস কমিশনারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে এক দরখাস্ত পাঠাই এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২২এ মার্চ দিল্লিতে পৌঁছে স্থানীয় পুলিস কমিশনারের কাছে ও মহামান্য বড়-লাট বাহাদুরকে টেলিগ্রাম করি। আমরা সেখান থেকে মুসৌরী যেতে অস্বীকার করে অমৃতসরে যাবার সঙ্কল্প প্রকাশ করি। কিন্তু উক্ত মিঃ সিউল এবং তাঁর রক্ষীদল হট্টগোল করে আমাদের কারাবাসের ভয় দেখায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রেল-পুলিসের সহায়তায় আমরা অমৃতসরে যাবার অনুমতি পাই। অমৃতসর থেকে মহারাজকে আমরা তার করি

এবং উত্তর পাই . ২৩এ মার্চ, ১৯২৪। অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনারের নিকটও ইতঃপূর্বে আমরা দরখাস্ত করেছিলাম, কিন্তু তা গৃহীত হয়নি।

"মহারাজের লোক অমৃতসরে আমাদের পিছু নেয় এবং নানা রকম ভয় দেখায়। এই সময় মহারাজার পরিচারকদের সর্দার কে এক শ্রীরাম-বাবু ওখানে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং মহারাজের সান্নিধ্য ত্যাগ করার ভয়ঙ্কর পরিণামের ভয় দেখিয়ে আমাদের ইন্দোরে ফিরে যেতে বলে। কিন্তু আমরা ফিরে যেতে অস্বীকার করি।

"অমৃতসরে থাকাকালীন আমাদের মোটর-চালকের সাহায্যে বিহারীলাল নামক একটি লোক আমার স্বামীর সঙ্গে পরিচিত হয়। এই বিহারীলাল যে কে, প্রকৃতপক্ষে তা আমরা জানতাম না। সে আমার স্বামীকে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বলে যে, সে একজন শাল-ব্যবসায়ী—দিল্লিতে টি. আর. আর. টি দাস মণিলাল এণ্ড কোং নামে তার একটি দোকান আছে এবং অপর একটি দোকান আছে বোম্বাইয়ে। তাছাড়া, তার এক ভাই ব্যারিষ্টার এবং বুলাকিদাস নামে আর এক ভাই বি. বি. এ্যাণ্ড সি. আই. রেলওয়ের সহকারী কনসল্‌টিং ইঞ্জিনীয়ার। উক্ত বিহারীলালকে আমাদের কাগজপত্র দেখানো হলে সে তার ব্যারিষ্টার ভায়ের কাছে আমাদের কাগজপত্র দাখিল করার অঙ্গীকার করে এবং ইন্দোরের মহারাজার বিরুদ্ধে, প্রয়োজন হলে অর্থ সাহায্য করে মাম্‌লা রুজু করার প্রতিজ্ঞা করে। বোম্বাইয়ে গিয়ে তার ভায়ের বাংলো আঁধেরীতে থাক-বার জন্যও সে আমাদের উপদেশ দেয় এবং তার এক চাকর রামলালকে সঙ্গে দেয় বোম্বাই যাওয়া স্থির হলে। অমৃতসর থেকে প্রথমে আমরা নাগপুরে যাই এবং সেখান থেকে ১৮ই জুলাই বোম্বাই আসি। ভিক্টোরিয়া

টারমিনাসে উক্ত বুলাকিদাসের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। তিনি আঁধেরীর পরিবর্তে তাঁর বাসেবার বাংলোতে আমাদের নিয়ে যান।

"বাসেবা স্থানটি নির্জন। সেখানে থাকতে থাকতেই আমরা জানতে পারি যে, আমাদের নব-পরিচিত বন্ধুগুলি সম্ভবতঃ মহারাজেরই চর— আমাদের হত্যা, অনিষ্ট অথবা বিপদে ফেলার জন্য নিযুক্ত এবং তারা সকলেই শ্রীরামবাবুর নির্দেশে পরিচালিত। সেই সময় আমরা উক্ত স্থান পরিবর্তন করে মদনপুরার হাকিম বিল্ডিংএ এসে আশ্রয় নিই। বাসেবা ত্যাগ করার সময় বুলাকিদাস আমাদের বাধা দেবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। তাছাড়া, তিনি তাঁর ভৃত্য রামলালকে আমাদের সঙ্গে মদনপুরায় গিয়ে আমাদের বাসা দেখে এসে তাঁকে খবর দেবার হুকুম দেন। বাসেবা ত্যাগ করার পূর্বেও আমরা বোম্বাই পুলিসের মিঃ ফুলারের সঙ্গে দেখা করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি। তিনি আমাদের যত শীঘ্র সম্ভব বাসেবা ত্যাগ করারই উপদেশ দেন।

হাকিম বিল্ডিংএ চলে আসবার পর রামলাল দু'এক দিনের জন্যে চলে যায় এবং ২৫এ জুন বেলা সাড়ে এগারটার সময় বিহারীলালকে নিয়ে ফিরে আসে। তারা সে রাত্রে হাকিম বিল্ডিংএ বাস করে। সেই সময় ভোরের দিকে এক দিন আমার স্বামী প্রার্থনা করতে যাবার সময়, তাঁর বিছানার তলায় টাকাকড়ি ও নথিপত্র রেখে যান। সেই ঘরেই রামলাল ও বিহারীলাল দু'জনে ঘুমচ্ছিল। প্রার্থনান্তে ফেরার সময় সিঁড়িতে বিহারীলালের সঙ্গে আমার স্বামীর দেখা হয়। এতো সকালে সে কোথায় যাচ্ছে, প্রশ্ন করলে সে বলে যে, সে চা পান করতে যাচ্ছে, অবিলম্বেই ফিরবে। কিন্তু আমার স্বামী ঘরে প্রবেশ করেই দেখেন যে, রামলালও যাবার জন্য পোষাক-পরিচ্ছদ পরছে। সন্দেহ-

ক্রমে তিনি বিছানার-তলায়-রাখা চোদ্দশো নব্বুই টাকা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলি খুঁজতে গিয়ে দেখেন, সেগুলি অন্তর্হিত। রামলালকে এ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় সে বলে, বিহারীলাল সে-সব নিয়ে পালিয়েছে। আমরা রামলালকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করি। সে পুলিসের কাছে জানায় যে, মহারাজার হুকুমে পূর্বকথিত শ্রীরামবাবু তাকে ও তার দলবলকে কাজে লাগিয়েছিল। আমার স্বামীকে সে একটি লিখিত কাগজ দেয়, তা থেকে দলের অন্যান্য লোকের কথা সুস্পষ্ট জানা যায়। তাদের মধ্যে : (১) বিহারীলাল (শাল-ব্যবসায়ী নয়, ইন্দোরের রাজ-দরবারের একজন এ্যাকাউন্‌টেণ্ট ; ইম্‌লিবাজারে থাকে)। (২) আন্না সাহেব (মহারাজার এ. ডি. সি. চৌপাট্টিতে থাকে)। (৩) বুলাকিদাস (বিহারীলালের বন্ধু এবং দিল্লির মণিলাল কোম্পানীর আর. এস. দাসের ভাই)। দিল্লিতে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যে সকল পত্র ও টেলিগ্রাম-বিনিময় হয়েছিল, তা সবই দেওয়া হয়েছিল। রামলালকে মাসিক দু'শো টাকা বেতনে বিহারীলাল ও শ্রীরামবাবুর অধীনে দিল্লিতে খবরাখবর দেবার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। (৪) নাথু বাঈ (রামলালের ভগিনী ; ইন্দোরে মাসিক তিনশো টাকা বেতনে অল্প দিন পূর্বে তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল)। অন্যান্য যারা যারা আছে, তাদের সে জানে না।

"ধৃত রামলালের জবানবন্দীতে জানা যায় যে, এই দলের উদ্দেশ্য ছিল আমার কন্যাকে বলপূর্বক ইন্দোরে নিয়ে যাওয়া অথবা তার নাক কেটে দেওয়া এবং যে কোন উপায়ে সম্ভব আমাকে আর আমার স্বামীকে হত্যা করা।

"এই অবস্থায় আমরা এই দল সম্বন্ধে অত্যন্ত ভীত হয়ে প্রার্থনা

করি, আপনি অনুগ্রহপূর্বক এ বিষয়ে সত্বর তদন্তের ব্যবস্থা ক'রে, উক্ত দলকে এই মর্মে সতর্ক করে দিন যে, তারা যেন আমাদের কারো অনিষ্ট করতে না পারে এবং শান্তিরক্ষা করতে বাধ্য হয়। এই সঙ্গে আমাদের আরও একটি নিবেদন এই যে, এ বিষয়ের তদন্তের ভার যেন পুলিস স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ফ্লারের উপরই দেওয়া হয়, কারণ তিনি এই ঘটনার পূর্বাপর সমস্তই অবগত আছেন।"…

এই আবেদন করার পরও বোম্বাইয়ে তেমন সোয়াস্তি না পেয়ে ওয়াজীর বেগম উত্তরাংশে গমন করেন—তাঁর সব চেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি একমাত্র নিধি মমতাজকে যদি নিরাপদে রাখতে পারেন তারই চেষ্টায়। বোম্বাইয়ে পুলিস কমিশনারকে আবেদন করার ছ'মাস পরে, পুনরায় অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার মিঃ এফ্. এন্. প্যাকেলের কাছে ওয়াজীর বেগম নিরাপত্তার জন্য দরখাস্ত করেন এবং সেই সঙ্গে পূর্বকার আবেদন-পত্রের নকলও দাখিল করেন। আবেদনে আদ্যোপান্ত মহারাজার নিযুক্ত ষড়যন্ত্রকারীদের ক্রিয়াকলাপেরও উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া ইতঃপূর্বে বোম্বাই পুলিস কর্তৃক অভিযুক্ত হয়ে, শ্রীরামবাবু চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট মমতাজকে জোর করে ছিনিয়ে মহারাজার কাছে নিয়ে যাবার জন্য তাকে যে ত্রিশ হাজার টাকা দেওয়ার স্বীকারোক্তি করে,—সে কথাও জানানো হয়।

কিন্তু এই আবেদন-নিবেদন সমস্তই বিফলতায় পর্যবসিত হয়। উক্ত আবেদনের উত্তরে ডেপুটি কমিশনার তাকে জানান যে, এ ব্যাপারে আপনার কথামত ব্যবস্থা অবলম্বন করার যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু কুচক্রীদের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র তখন তাদের চতুর্দিকে এমনই ব্যূহ রচনা

করে ফেলেছিল যে, তার ভেতর থেকে আত্মরক্ষার আর কোন উপায়ই ছিল না। সপ্তাহখানেক যেতে না যেতেই প্রমাণ হ'ল যে, ওয়াজীর বেগমের ভীতি অমূলক নয়।

ইন্দোরের খেলা শেষ হলে, বোম্বাইয়ে এসে নানা প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও বিবিজান মমতাজ সাহেবা আবদুল কাদের বাওলা নামক এক বিশিষ্ট ধনী মুসলমানের প্রেমিকারূপে উপার্জন ও যৌন-সম্ভোগ বাসনার অনলে নিজেকে উৎসর্গ করেন। বাওলার ঐশ্বর্যের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে মমতাজ দিনের পর দিন তাঁকে নিয়ে বহু স্থানে ঘোরাফেরা করতে থাকেন। মোটর-বিহার ছিল তাঁদের আনন্দ-উপভোগের একটি বিশেষ অঙ্গ। মিঃ বাওলাও মমতাজকে ভালোবেসেছিলেন সর্বস্ব দিয়ে। তাঁর সমস্ত সত্তা মমতাজের প্রেমের দরিয়ায় তলিয়ে গিয়েছিল। প্রথম দিকে বাওলা মমতাজকে অন্য এক ভাড়াটিয়া বাড়িতে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেও, পরে চৌপাট্টিতে তাঁর প্রাসাদতুল্য নিজের বাড়িতেই তাদের এনে রাখেন। সময় সময় বিবাহিতা স্ত্রীর চেয়েও রক্ষিতার আদর যে কত বেশি হতে পারে, তা পুরুষপটনপটীয়সী নর্তকী মমতাজের প্রতি বাওলার ভালোবাসার আতিশয্য দেখলে সহজেই বোঝা যায়। গাড়ির মধ্যে বহু সময় তাঁদের পরস্পরকে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে যেতে দেখা যেত। কিন্তু বেশি দিন এই সুখভোগ বাওলার ভাগ্যে সহ্য হ'ল না। মমতাজের প্রতি তাঁর এই দুর্নিবার আকর্ষণ মহারাজের গুপ্তচরদের আরও উত্তেজিত করে তুললো এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য তারা যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তা যত তাড়াতাড়ি কার্যে পরিণত করা যায় তার জন্য তারা বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলো।

ইতোমধ্যে মিঃ বাওলা মমতাজকে নিয়ে কুড়ি দিন লোনাভলা নামক স্থানে প্রমোদ-বিহারে কাটিয়ে ১০ই জানুয়ারী পুনরায় ফিরে আসেন চৌপাট্টিতে। সেই সময় এক মুহূর্তের জন্যও মমতাজকে কাছ-ছাড়া করতে পারতেন না বাওলা। ক্ষণিকের অদর্শন যুগান্তের অপ্রীতি নিয়ে আসত তাঁর মনে। মোটরে প্রত্যহই তাঁরা সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরুতেন এবং নানা স্থান ঘুরে, কখনো সিনেমা দেখে, কখনো কেনা-কাটি ক'রে ফিরে আসতেন রাত্রের দিকে। মধ্যে মধ্যে হোটেলে মদ্যপান করে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত তাঁদের।

সেদিন ১২ই জানুয়ারী। আবহাওয়া মোটেই ভাল ছিল না। কন্‌কনে বাতাস বইছিল সকাল থেকেই। বিকেলের দিকে সে বাতাস বাড়তে বাড়তে জল-ঝড়ের ভাব দেখা দিল। বাওলা সেদিন বাইরে বেরুতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তখন তাঁর ভাগ্যনিয়ন্তা মমতাজ। মমতাজের কথায় জীবনপাত করাও তাঁর পক্ষে আশ্চর্য ছিল না। বাওলার কথায় মমতাজের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'এই ত' বেরুবার দিন! তুমি যেন কেমন বুড়িয়ে যাচ্ছ দিন-দিন—এই সামান্য ঠাণ্ডাতেই তুমি ভয় পাচ্ছ!'

মমতাজের কথা কোথায় যেন বাওলাকে কাঁটার মত বিঁধল। তবে কি তিনি সত্যিই বুড়িয়ে যাচ্ছেন? পুরুষের পৌরষে এ সব কথা কোথায় যেন আঘাত হানে—বিশেষ করে স্ত্রীলোকের কাছ হতে এলে ত' কথাই নেই! বয়স তাঁর হয়েছিল বটে, কিন্তু সে বয়স মোটেই বুড়িয়ে যাবার বয়স নয়। তিনি তাঁর প্রাণপ্রিয়া প্রেমিকাকে সাদরে আলিঙ্গন করে বললেন, 'তুমি যদি বলো প্রিয়তমা, তা'হলে আমি এখুনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেও রাজী আছি—ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়া ত' কোন্ ছার!'

তখুনিই গাড়ি প্রস্তুত হ'ল, দু'জনে গরম জামা-কাপড় পরে বেরিয়ে পড়লেন তাঁরা। সেদিন অভিসারিকার মত অপূর্ব সাজে সেজেছিলেন শ্রীমতী মমতাজ। কিন্তু কে জানত, মৃত্যু তার দুর্নিবার আকর্ষণে বাওলাকে সেদিন টানছে তার চরম সত্য প্রকাশে!

মোটর দুরন্তগতিতে ছুটে চললো শহরের পথে। শহরের পথ ছেড়ে মালাবার হিলের দিকে গাড়ি এসে পৌঁছল। শীতের দিন ছোট, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে তাড়াতাড়ি। ঘুরতে ঘুরতে প্রায় সাতটা বেজে গেল। ঠাণ্ডা হাওয়া গাড়ির মধ্যে ঢুকে দু'জনকেই তখন কাঁপিয়ে তুলেছে। মমতাজের মুখটা বাওলা তাঁর বুকের মধ্যে চেপে রেখে চলেছিলেন। যতটা সম্ভব ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসেছিলেন তাঁরা দু'জনে। কিন্তু এই নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ প্রেমিক-প্রেমিকার সান্ধ্য-ভ্রমণের মধ্যে বাওলা বা মমতাজ কেউ কি তখন কল্পনাও করতে পেরেছিলেন যে, তাঁদের একজনের দিন ঘনিয়ে এসেছে,—আর কয়েক মুহূর্ত পরেই পৃথিবীর সব-কিছু বাওলার কাছে অন্ধকার হয়ে যাবে!

মালাবার হিল। রীজের উপর হ্যাঙ্গিং গার্ডেনের কাছে বাওলার গাড়ি যেই মোড় ফিরছে, ঠিক সেই সময় অতর্কিতে আর একখানা গাড়ি এসে তাঁর গাড়ির সঙ্গে সজোরে ধাক্কা মারলে। অপর গাড়ির চালক হয়ত প্রকৃতিস্থ নেই মনে করে, বাওলার ড্রাইভার গাড়ি ব্রেক করার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় গাড়ি থেকে পাঁচজন সশস্ত্র লোক লাফিয়ে পড়ে প্রথমেই আক্রমণ করলে গাড়ির সোফারকে। তার সঙ্গে হাতাহাতি বেধে গেল। মমতাজের পাশেই ছিলেন বাওলা, আর বাওলার পাশে ছিলেন বাওলা-ষ্টেটের ম্যানেজার ম্যাথু। ইনি কয়েক মিনিট পূর্বে পথিমধ্যে গাড়িতে উঠেছিলেন।

আক্রমণের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিলেন বাওলা। তাঁকে গুলি করে মৃত মনে করে গাড়ি থেকে টেনে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। ম্যাথু আহত হয়ে গাড়ির অপর দিকে লাফিয়ে পড়েন।

এই আক্রমণ যখন পুরো মাত্রায় চলেছে, ঠিক সেই সময়, ঘটনাচক্রে, তাঁদের রক্ষা করার জন্যেই যেন ঈশ্বর-প্রেরিত চার জন লোক ঘটনা-স্থলে এসে উপস্থিত হন। এঁরা চার জনই ছিলেন ইংরেজ রাজকর্মচারী। 'উইলিংডন ক্লাব' থেকে ফেরবার পথে, ভুলক্রমে পথ ভুলে তাঁরা ঐ স্থানে এসে উপস্থিত হন। গুলির আওয়াজ শুনে তাঁরা দ্রুত সাহায্য করার জন্য সেদিকে এগিয়ে যান। একজন দুর্বৃত্ত তখন ছোরা নিয়ে মমতাজকে আক্রমণ করতে যাচ্ছিল, লেঃ সেগার্ট তাকে বাধা দেবার জন্য প্রথমেই সেদিকে ছুটে যান। লোকটা তৎক্ষণাৎ ছোরা ফেলে রিভলবার বার করে তাঁর দিকে গুলি ছোঁড়ে, কিন্তু সেগার্ট অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তা এড়িয়ে কৌশলে আততায়ীকে ধরে ফেলেন।

অন্যান্য অফিসারদের মধ্যে ছিলেন : কঃ ভিকার্স, লেঃ বেট্‌লি, লেঃ ষ্টিভেন্স। লেঃ বেট্‌লির হাতে ছিল গল্‌ফ খেলার একটি ষ্টিক্‌ এবং আত্ম-রক্ষার জন্য অস্ত্র বলতে ওঁদের হাতে এটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই গল্‌ফ ষ্টিক্‌কেই বেপরোয়া চালিয়েছিলেন লেঃ বেট্‌লি। মমতাজকে দুর্বৃত্তরা তাদের গাড়িতে তুলে চম্পট দেওয়ার মুখে উদ্ধার করা হয়। তাঁর মাথায় ও মুখে গুরুতর আঘাত লাগে। নাকটা চিরকালের মত নষ্ট হতে হতে কোন রকমে রক্ষা পায়। কিছুক্ষণ উভয়পক্ষের হইচই চীৎকার শব্দ ও আর্তনাদের মধ্যে স্থানীয় অধিবাসীরা এসে পড়ায় আক্রমণকারীরা পলায়ন করে। গাড়িতে সারাক্ষণ তাদের ষ্টার্ট দেওয়াই ছিল। কিন্তু এই দুর্বৃত্তদের মধ্যে লেঃ সেগার্ট যাকে

ধরেছিলেন, নানান চেষ্টা করেও সে আর শেষ পর্যন্ত পালাতে পারে নি। এই ব্যক্তির নাম : সফী আমেদ।

বাওলা ও অন্যান্য আহতদের স্থানীয় জে. জে. হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরের দিন প্রত্যূষে মিঃ আবদুল কাদের বাওলার মৃত্যু ঘটে। সারা রাত্রির মধ্যে একবারের জন্যও তাঁর চৈতন্য ফিরে আসেনি। তাঁর আদরের মমতাজকে ফেলে চিরতরে তিনি বিদায় নেন এই পৃথিবী থেকে। শ্রীমতী মমতাজও তখন ঐ হাসপাতালে। তিনি সারাক্ষণ বাওলার সংবাদের জন্য অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু-সংবাদ শুনে অশ্রু-সংবরণ করতে পারেন নি।

এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। লোক-মুখে, ক্লাবে, রেষ্টুরেণ্টে, সিনেমায়, খেলার মাঠে সকলের মুখেই চলতে থাকে ঐ এক কথা। পুলিস সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে ওঠে। আক্রমণকারীদের সন্ধানের জন্য জোর তদন্তের ব্যবস্থা হয় সর্বত্র। বোম্বাই, পুণা, অমৃতসর এবং ইন্দোর প্রভৃতি সকল জায়গাতেই সন্দেহ-জনক লোকদের পুলিস গ্রেপ্তার করতে থাকে। ঐ লোকগুলো মহারাজার পোষ্য না হলেও, তারা যে ইন্দোর থেকেই এসেছিল, সে বিষয়ে কারুরই কোন সন্দেহ না থাকায়, পুলিস ইন্দোর রাজ্য একেবারে তোলপাড় করে ফেলে এবং কয়েক জনকে গ্রেপ্তার ক'রে জবানবন্দী নেয়। এ ছাড়া, অকুস্থলে আসামী সফী আমেদকে হাতে-নাতে ধরার দরুনও পুলিসের এ ব্যাপারে অনেকটা সুবিধা হয়ে যায়, তা না হলে কাজটা এতো সহজে হতো না। পুলিসের জানা যত রকম পথ আছে, এ ব্যাপারে সবই অবলম্বন করা হয়েছিল সঠিক সূত্র আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে। মমতাজের মা ওয়াজীর বেগম ও মমতাজ এই ষড়যন্ত্রের পূর্বাপর সমস্ত কাহিনী

পুলিসের ডিটেকটিভ্ বিভাগের কাছে প্রকাশ ক'রে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত পুলিস লেঃ সেগার্ট, মমতাজ ও অন্যান্য সকলের প্রাথমিক বিবৃতি গ্রহণের পর, আবদুল কাদের বাওলাকে হত্যা করার অভিযোগে সবসুদ্ধ ন'জন আসামীকে বিচারার্থ বোম্বাই হাইকোর্টে হাজির করে। এই ন'জনের সকলেই ইন্দোর ষ্টেটের লোক। এদের নাম: (১) সফী আমেদ—ইন্দোর অশ্বারোহী পুলিসের রিসালদার। (২) পুষ্পশীল পাণ্ডে—ইন্দোরের সহকারী এ. ডি. সি। (৩) বাহাদুর শা—মোটর ড্রাইভার, ইন্দোর। (৪) আকবর শা—ইন্দোরের অধিবাসী। (৫) রামরাও দিঘে—ইন্দোর বিমান-বাহিনীর ক্যাপ্টেন। (৬) মোমতাজ মহম্মদ—সাব ইন্‌স্‌পেক্টার, ইন্দোর সি. আই. ডি। (৭) আবদুল লতিফ—মোটর-ড্রাইভার, ইন্দোর। (৮) কেরামৎ খাঁ—ইন্দোর ইম্পিরিয়াল ল্যান্সারের পে সার্জেণ্ট। (৯) আনন্দরাও ফান্সী—ইন্দোর্ ফোর্সের য়্যাড্‌জুট্যাণ্ট জেনারেল।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২৭এ এপ্রিল সাড়ম্বরে এই চাঞ্চল্যকর ষড়যন্ত্র ও হত্যাকাণ্ডের বিচার, মিষ্টার জাষ্টিস্ ক্রম্পের আদালতে স্পেশাল জুরীদের সমক্ষে আরম্ভ হয়। সারা শহরের লোক ভেঙে পড়ে আদালত-গৃহে বিচার দেখবার জন্য। কর্তৃপক্ষকে শেষ পর্যন্ত এই জন-সমাগম রোধ করবার জন্য আদালত-গৃহে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হয়। তৎকালীন কয়েকজন বিখ্যাত আইনজীবী এই মামলায় অংশ গ্রহণ করেন।

ফরিয়াদী পক্ষ সমর্থন করেন স্যার (তখন মিঃ) জামসেদজী কাঙ্গা, এ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল, বম্বে। তাঁর সহকারী ছিলেন মিঃ কেনেথ্

কেম্প (ইনি পরে বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি হন)। অপর দিকে এক নম্বর আসামী সফী আমেদের পক্ষে দাঁড়ান তৎকালীন কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ও পরবর্তী কালে আমাদের রাজনৈতিক নেতা দেশপ্রিয় মিঃ জে. এম. সেনগুপ্ত। এ ছাড়া, দুই থেকে আট নম্বর আসামীর পক্ষ সমর্থন করেন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও পরবর্তী কালে পাকিস্তানের সর্বাধিনায়ক মিঃ এম. এ. জিন্না। ইন্দোর ষ্টেটের পাবলিক প্রসিকিউটার মিঃ টি. রাম সিং আসামী পক্ষের আইনজীবীদের উপদেষ্টা নিযুক্ত হন।

আসামীরা নিজেদের নির্দোষ অভিহিত করার পর জুরীদল গঠন ক'রে এ্যাডভোকেট জেনারেল মামলার উদ্‌ঘাটন করেন, এবং অত্যন্ত তীব্র ও আবেগপূর্ণ ভাষায় বলতে থাকেন যে: আসামীদের গ্রেপ্তার করার পূর্বে এদের অধিকাংশই ইন্দোরের মহারাজার কর্মচারী ছিল এবং এরা সকলেই ইন্দোরের বাসিন্দা। ১৯২৪ সালের ২৪এ অক্টোবর থেকে ১৯২৫ সালের ১২ই জানুয়ারীর মধ্যে এই সকল আসামীরা বোম্বাই, পুণা, লোনাভলা ও অন্যান্য বহু স্থানে ইন্দোরের মহারাজার প্রাক্তন রক্ষিতা মমতাজ বেগম, যিনি কিছুকাল মহারাজার সঙ্গে ইন্দোরে বসবাস করেছিলেন, এবং যাঁর কমলা বাঈ নামকরণ করে তিনি ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়েছিলেন—তাকে হরণ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। কালক্রমে এই ষড়যন্ত্র ১২ই জানুয়ারী সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকার সময় এক নিদারুণ হত্যাকাণ্ডে পর্যবসিত হয়। অভিযুক্ত আসামীদের মধ্যে ফান্সী যদিও প্রকৃত অপরাধের অনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত ছিল না, তবুও তাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

মামলার বিবরণ দাখিল প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, মমতাজের

বর্তমান বয়স বাইশ বৎসর। বিলাত থেকে ফিরে আসার পর পর্যন্ত তিনি মহারাজার লীলা-সঙ্গিনী ছিলেন। ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শিকারে গিয়ে মহারাজার সঙ্গে তাঁর কলহ হয় এবং তিনি মহারাজার সংসর্গ ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হন। ১৮ই মার্চ তিনি কমলা বাঈ নামে মহারাজার বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের পুলিস কমিশনারের নিকট দরখাস্ত করেন। পরে মহারাজা তাঁকে সিউল নামক এক কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে মুসৌরী পাঠান। দিল্লিতে পৌঁছে তিনি মুসৌরী যেতে অস্বীকার ক'রে তাঁর পিতামাতার সঙ্গে অমৃতসর যাত্রা করেন। মহারাজার নিকট ফিরে যাবার জন্য তাঁকে অমৃতসরে পীড়াপীড়ি করা হয়। সেই কারণে মমতাজ অমৃতসর ত্যাগ ক'রে নাগপুর হয়ে বোম্বাই উপস্থিত হন। সেখানে তাঁর সঙ্গে বাওলার পরিচয় হয় এবং তাঁর রক্ষিতারূপে তিনি অবস্থান করেন। কয়েকবার প্রমোদ-ভ্রমণ শেষ ক'রে ১০ই জানুয়ারী মিঃ বাওলা ও মমতাজ বোম্বাইয়ে ফিরে আসেন। ১২ই জানুয়ারী বাওলা নিহত হন। বোম্বাইয়ে ইন্দোর ষ্টেটের অনেকগুলি প্রাসাদ আছে। সেগুলির মধ্যে প্রধান হ'ল 'সোমরসেট হাউস' ও 'অরোরা হাউস'। এইখানেই প্রথম মমতাজ-হরণের ষড়যন্ত্র পরিকল্পিত হয়। দুই ও নয় নম্বর আসামী এই ষড়যন্ত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল বলে মনে হয়। হত্যা-অনুষ্ঠানের পূর্বে তারা বোম্বাইয়ে বহুবার আসা-যাওয়া করে। ১৪ই অক্টোবর ফান্সী ১৬,০০০ টাকা ধার করেছিল, গাড়ি কিনে মমতাজকে সেই গাড়িতে হরণ ক'রে ইন্দোর নিয়ে যাবার জন্য। ২৩এ তারিখে তারা দু'জনে একখানা ম্যাক্সওয়েল গাড়ি কেনে। মমতাজের গতিবিধি সম্বন্ধে তার আত্মীয়দের কাছ থেকে আসামীরা সাহায্য পায়। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি যখন তারা জানতে

পারে যে, মমতাজ লোনাভলাতে আছে, তখন ষড়যন্ত্রের কর্মস্থল পুণাতে স্থানান্তরিত করেছে তারা। লোনাভলা থেকে পুণা মাত্র কয়েক মাইলের পথ।

ফরিয়াদী পক্ষের কাউন্সেল মামলার বিবরণ প্রসঙ্গে বলেন যে, হত্যাকাণ্ডের পূর্বে ম্যাক্সওয়েল গাড়িতে আসামীদের সওয়া ছ'টার সময় দেখা যায় ক্রফোর্ড মার্কেটের কাছে এবং তারপর মালাবার হিলের ফিরোজশা মেটা গার্ডেনের নিকট। এই গাড়িখানি মিঃ বাওলার পিছু নিয়ে সারা শহর ঘুরেছিল। বাগানের কাছে তারা তাঁর নাগাল পায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, যেন-তেন-প্রকারেণ বাওলার কাছ থেকে মমতাজকে ছিনিয়ে গাড়িতে তুলে ইন্দোরে পলায়ন করা। সেই সময় দৈবক্রমে ঘটনাস্থলে বৃটিশ অফিসারদের উপস্থিতি ঘটে এবং আক্রমণ-কারীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। সেই পদস্থ সামরিক ইংরেজ কর্মচারীদের সাহস ও সহায়তা ব্যতীত আততায়ীর পাত্তা পাওয়া মোটেই সম্ভব হ'ত না—তারা বিনা বাধায় তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'রে উধাও হ'ত। অফিসাররা প্রথম আসামী সফী আমেদকে ঘটনাস্থলেই ধরে ফেলেন। তার কাছে একটা পিস্তল, একটা কুকরী ও একটা ছোরা পাওয়া যায়। এ্যাড্ভোকেট জেনারেল সামরিক কর্মচারীদের সঙ্গে আসামীদের সংঘর্ষ বর্ণনা করেন—বিশেষ করে সফী আমেদের সঙ্গে। এই সংঘর্ষের প্রথম মুখে মিঃ বাওলা এবং লেঃ সেগার্ট গুরুতরভাবে আহত হন; তাঁদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হ'লে বাওলা মৃত্যুমুখে পতিত হন। লেঃ সেগার্ট কয়েক দিন পরে আরোগ্য লাভ করেন।

এর পর ফরিয়াদী পক্ষের প্রথম সাক্ষী হিসাবে শ্রীমতী মমতাজ বেগমকে হাজির করা হয়। সাক্ষীর কাঠগড়ায় বেগম সাহেবা ভয়ে

ভয়ে ও অপেক্ষাকৃত সলজ্জভাবে উপস্থিত হলেও, বেশ নাটকীয়ভাবে তাঁর কাহিনী বর্ণনা করেন। তখনো তাঁর কপালে ক্ষত-চিহ্ন ছিল। কিন্তু তা'হলেও তাঁর মুখশ্রী উজ্জ্বল ও তাঁকে সুন্দরই দেখাচ্ছিল।

মমতাজ এগারো বারো বৎসর পূর্বে প্রথম তাঁর মা'র সঙ্গে ইন্দোরে যান। সেখানে মহারাজা তাঁকে তাঁর গায়িকা নিযুক্ত করেন। এর অল্প কিছু দিন পরে তিনি ত্ব'মাসের ছুটিতে হায়দ্রাবাদ যান এবং সেখান থেকে ফিরে ইন্দোরে বৎসরাধিক কাল অতিবাহিত করেন।

এর আরও কিছুকাল পরে মহারাজার সঙ্গে তাঁর মনান্তর হয় এবং মহারাজা তাঁকে ভালোবেসে এত দিন যে সব মূল্যবান অলঙ্কার উপহার দিয়েছিলেন, সে সব কেড়ে নিয়ে তাঁকে ষ্টেট্ ত্যাগ করে চলে যেতে আদেশ দেন।

ঘটনাটি কোর্টে মমতাজ কর্তৃক এইভাবে বর্ণিত হবার সময়, আসামী পক্ষের কৌঁসিলী আপত্তি করেন যে, যে লোক এই মামলায় জড়িত নয়, তার উপর অযথা দোষারোপ করা হচ্ছে।

বিচারপতি ভূমিকা সংক্ষেপ করতে বলেন।

বর্ণনা প্রসঙ্গে মমতাজ বলেন যে, তিনি অমৃতসরে যেতে বাধ্য হন, কিন্তু তিন মাসের মধ্যেই ষ্টেটের শঙ্কররাও নামক একজন কর্মচারী সেখানে গিয়ে তাঁকে ইন্দোরে ফিরে যেতে বলেন। তাঁর কথা মত তিনি পুনরায় মহারাজার রক্ষিতা হিসাবে বাস করার জন্য ইন্দোরে ফিরে যান, এবং সেই ভাবেই প্রায় দশ বৎসর মহারাজার নিকট থাকেন। সেখানে প্রথম দিকে তিনি বেগম মমতাজ নামেই পরিচিত ছিলেন, কিন্তু মহারাজার সঙ্গে বিলাত যাবার সময় তাঁর নাম পরিবর্তন করে কমলা বাঈ রাখা হয়। বিলাত থেকে ফেরবার পর মহারাজার ঔরসে

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এর পর তিনি মহারাজার সঙ্গে ভানপুর গমন করেন, এবং সেখান থেকেই বোম্বাই পুলিস কমিশনারের নিকট দরখাস্ত ক'রে তাঁর এবং তাঁর মাতা-পিতার নিরাপত্তার আবেদন জানান। সেই আবেদনপত্রে অভিযোগ করা হয় যে, মহারাজা তাঁকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মত যে সব অলঙ্কার দিয়েছিলেন, তা সমস্তই তিনি কেড়ে নিয়েছেন। এই আবেদনপত্র দাখিল করার পর, তাঁকে ইন্দোর রাজ-ষ্টেটের সহকারী পারিবারিক কর্মকর্তা মিঃ সিউলের হেপাজতে মুসৌরী পাঠানো হয়। দিল্লিতে তিনি ট্রেন থেকে নেবে মুসৌরী যেতে অস্বীকার ক'রে অমৃতসর যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মিঃ সিউল পূর্ব-ব্যবস্থার এই পরিবর্তনে অসম্মতি প্রকাশ করে বটে, কিন্তু তিনি কোন প্রকারে তাঁর ইচ্ছা মত অমৃতসরে যেতে সমর্থ হন। সেখানেও তিনি স্থানীয় ডেপুটী কমিশনারকে এই মর্মে এক দরখাস্ত করেন যে, মহারাজার লোক কর্তৃক তিনি নিপীড়িত এবং অনবরত হয়রান হচ্ছেন। অমৃতসরে তিনি তাঁর পাহারাদার হিসাবে দু'জন গোর্খাকে নিযুক্ত করেন। অমৃতসর থেকে নাগপুর গেলে, মহারাজার লোক গুপ্তভাবে তার অনুসরণ করতে থাকে। সেখান থেকে তিনি বোম্বাই যান এবং মিঃ বাওলার সঙ্গে পরিচিত হন। তিনিই তাঁকে ওখানে একটি বাড়িতে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। মিঃ বাওলার সঙ্গে তিনি কয়েকবার বিভিন্ন স্থানে প্রমোদ-ভ্রমণে গিয়েছিলেন এবং শেষে তাঁর চৌপাট্টির বাড়িতে এসে তাঁর সঙ্গেই বসবাস করতে থাকেন।

রূপোপজীবিনী মমতাজ আরও বলেন যে, মিঃ বাওলার সঙ্গে তিনি ডিসেম্বর মাসে লোনাভলা যান এবং সেখানে প্রায় কুড়ি দিন (১০ই জানুয়ারী পর্যন্ত) বাস করেন। তারপর সেই দিনকার কথা তিনি বর্ণনা

করেন—যেদিন এই ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ পায়। সেদিন বাওলার সঙ্গে গাড়িতে তিনি বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, সেই গাড়ির ড্রাইভার ছিল মহম্মদ সফী। হঠাৎ তাঁদের গাড়ি আক্রান্ত হয় এবং ম্যাক্সওয়েল গাড়ির আরোহীদের অতর্কিত আক্রমণের বিশদ বিবরণও তিনি বলেন। প্রথমেই আততায়ীরা মিঃ বাওলাকে গালি দেয় এবং তাঁকে গাড়ি থেকে নাবিয়ে দিতে বলে। ম্যাক্সওয়েল গাড়ির দুর্বৃত্তরা দুই দলে ভাগ হয়ে তাঁদের গাড়িখানা ঘিরে ফেলে। একজন আক্রমণ-কারী মিঃ বাওলার গাড়ির ভিতর মুখ ঢুকিয়ে তাঁকে গুলি করে—যে-দিকে মমতাজ বসেছিলেন, সেই দিক থেকে। গুলি করার পর অপর একজন মমতাজকে গাড়ি থেকে টেনে বার করে নিয়ে ছুরি দিয়ে কপালে আঘাত করে। তাকে টেনে রাস্তার অপর পারে নিয়ে যাওয়া হয়। ইতোমধ্যে কয়েকজন বৃটিশ কর্মচারী একখানা গাড়ি করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তাঁরা গাড়ি থামিয়েই নেমে পড়েন। যে লোকটা মমতাজকে আঘাত করেছিল, সে তাকে অপর গাড়িতে বসায়, কিন্তু মমতাজ জোর করে বেরিয়ে আসে; তখন আবার তার মুখে ছুরিকাঘাত করা হয়। এর পর সেই বৃটিশ কর্মচারীরা তাঁকে উদ্ধার করেন। তিনি মিঃ বাওলাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। তাঁকে যে লোকটা ছুরির দ্বারা আঘাত করেছিল, বৃটিশ কর্মচারীরা তাকে তৎক্ষণাৎ যে ধরে ফেলেন, তিনি তা দেখেছিলেন। এই লোকটিই এক নম্বর আসামী, সফী আমেদ।

অশ্রুসিক্ত নয়নে মমতাজ মিঃ বাওলার রক্তচিহ্নযুক্ত পরিচ্ছদ সনাক্ত করেন। সেগুলি তিনি নিহত হবার সময় পরিধান করেছিলেন। মমতাজ তাঁর নিজের কপালের ক্ষতচিহ্ন দেখান। এ্যাড্‌ভোকেট

জেনারেল বলেন, এই ক্ষতচিহ্ন তাঁর মুখখানিকে চিরকালের মত বিকৃত করে দিয়েছে।

আসামী সফী আমেদের কৌঁসিলী মিঃ সেনগুপ্তের জেরার উত্তরে মমতাজ বলেন যে, তিনি হায়দ্রাবাদে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। সেখানে তিনি প্রথমবার আড়াই বছর ছিলেন। তারপর তিনি ইন্দোরে যান। তৃতীয় বার ইন্দোরে যাবার পর তিনি মহারাজার রক্ষিতা নিযুক্ত হন। সেবার ইন্দোরে গিয়ে তিনি প্রায় এক বছর ছিলেন। তাঁর বয়স পঁচিশ বৎসর এ কথা সত্যি নয়। পাকাপাকিভাবে ইন্দোর ত্যাগ করবার ছ'বছর পূর্বে তাঁর মা অভিযোগ করেন যে, তাঁকে জোর করে ইন্দোর নিয়ে যাওয়া হয়েছে—এ কথাও সত্য নয়। তিনি জানেন না যে, মিসেস্ সেন তাঁর বয়স সতেরো বছর ব'লে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। এই সময় এ্যাড্ভোকেট জেনারেল বলেন যে, অনুসন্ধানের কাজ সংক্ষেপ করার জন্য তিনি জন্ম-তারিখের সার্টিফিকেট দাখিল করবেন। বিচারপতি এতে মন্তব্য করেন যে, মমতাজের বয়স বাইশ বা চল্লিশ যাই হোক তাতে এই মামলার কিছু যায় আসে না।

সাক্ষী পুনরায় বলতে আরম্ভ করেন যে, মহারাজ তাঁকে যে সকল অলঙ্কার দিয়েছিলেন, সে সব তাঁর মা রেখেছেন, এ কথা তিনি বলেন নি। ইন্দোরে তাঁকে একটা বাংলো দেওয়া হয়েছিল, সেখান থেকে পরে তাঁকে পুরনো প্রাসাদে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখান থেকে তাঁর বাইরে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কেবলমাত্র তাঁর শিশুর জন্মের সময় তাঁর কাছে তাঁর আত্মীয়দের বাস করতে দেওয়া হয়েছিল। ভানপুরা থেকে তাঁর সৎ-পিতা বোম্বাই পুলিসে নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেন। সেখানে তাঁকে কড়া পাহারাধীনে রাখা হয়। প্রথম প্রথম

ইন্দোরে তাঁর উপর ভালো ব্যবহার করা হ'ত বটে, কিন্তু পরে সে ব্যবহার সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। সুযোগ পেলেই তিনি তখন মহারাজার সঙ্গ এড়াতে চাইতেন। বোম্বাইয়ে জাহাজে একজন পুলিস কর্মচারী তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। উক্ত পুলিস কর্মচারীকে তিনি বলেছিলেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় ইংলণ্ড যাচ্ছেন। এ কথা তাঁকে প্রাণের ভয়েই বলতে হয়েছিল, কারণ মহারাজ এর পক্ষকাল পূর্বেই ইংলণ্ড চলে যান। পালাবার পক্ষে সেটা খুব ভালো সুযোগ মনে হলেও, প্রাণের ভয়ে তিনি তা করতে পারেন নি। বিলাত যাবার দু'মাস পূর্বে যুবরাজের বিবাহের সময় তাঁকে কিছু অলঙ্কার উপহার দেওয়া হয়। বাকী দশ বৎসর ইন্দোরে থাকাকালীন তিনি কোন টাকাকড়ি পাননি। তিনি দিল্লিতে পৌঁছানোর সময় তাঁর সঙ্গে বাইশ বাক্স সোনার অলঙ্কার ছিল, এ কথা মোটেই সত্য নয়। তাঁর কাছে মাত্র ছ'সাতটি বাক্স ছিল।

এই ধরনের বহু কথা বার করার জন্য পুরো দু'দিন ধরে শ্রীমতী মমতাজকে জেরা করা হয়েছিল, এবং তিনজন ধুরন্ধর পাকা কৌঁসিলীর জেরায় তিনি ভালোভাবেই উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

এইভাবে দিনের পর দিন এই চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের বিচার চলতে থাকে। ফরিয়াদী পক্ষের অনেকগুলি সাক্ষীকে পর-পর পরীক্ষা করা হয়। এদের মধ্যে প্রধান এক সাক্ষী হ'ল বোম্বাইয়ের এক ট্যাক্সী ড্রাইভার—মমতাজের মায়ের এক জ্ঞাতি-ভাই, আল্লাবক্স। আবদুল করিম নামে এক ব্যক্তি একদিন তাকে এসে জানায় যে, মহারাজা তার সঙ্গে দেখা করতে চান। এর দু'দিন পরে এই লোকই তাকে বলে যে, মহারাজার এ. ডি. সি. বকাউল্লা সাক্ষীকে অরোরা হাউসে দেখা করার জন্য আহ্বান করেছেন। সাক্ষী সেখানে গিয়ে সফী আমেদ, পাণ্ডে, বাহাদুর শা,

মমতাজ মহম্মদ ও ফাঙ্গীকে দেখতে পায়। এদের সকলের কাছ থেকে সাক্ষী অবগত হয় যে, মমতাজকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে মহারাজা তাদের পাঠিয়েছেন। এই সময় মমতাজ বাওলার সঙ্গে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। আসামী সফী আমেদ ও আকবর সর্বত্র তাদের অনুসরণ করে। এ কথা জেনে সে বাওলার ড্রাইভারকে টেলিগ্রাম করে, তার প্রভুকে সাবধান থাকতে ব'লে। পরে পুনরায় আবদুল করিম এবং বাকাউল্লার সঙ্গে দেখা হলে সাক্ষী জানতে পারে যে, বাওলার প্রহরীকে দু'হাজার টাকায় হাত করা হয়েছে এবং তাকে ইতোমধ্যেই এক হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে এই সর্তে যে, বাওলা চলে গেলে পর সে তাদের হাউসের পেছনের দরজা খুলে রাখবে, যাতে আসামীরা সহজে মমতাজকে নিয়ে যেতে পারে। সাক্ষী বাওলাকে এ খবর দিলে, সে প্রহরীকে বরখাস্ত করা হয়। সাক্ষী আরো বলে যে, একখানা লাল রঙের ম্যাক্স্‌ওয়েল গাড়িতে তাকে অরোরা হাউসে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন সঙ্গে ছিল আবদুল করিম, পাণ্ডে, সফী আমেদ আর মেহের শা।

যখন লেঃ সেগার্ট বলতে ওঠেন : কি ভাবে তিনি ও তাঁর বন্ধুরা অসীম দুঃসাহসিকতার সঙ্গে এই উদ্ধারকার্য করেছিলেন, তখন সারা আদালত-গৃহ লোকে লোকারণ্য। সত্যি কথা বলতে কি, এই উত্তেজনা-পূর্ণ মারাত্মক ঘটনার মধ্যে তিনি অন্যতম প্রধান ব্যক্তি।

লেঃ সেগার্ট যা বলেন, তার সংক্ষিপ্তসার হ'ল—১২ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় কঃ ভিকার্স, লেঃ বেট্‌লি ও লেঃ ষ্টিভেন্সের সঙ্গে তিনি উইলিংডন ক্লাব থেকে গলফ্‌ খেলে গাড়িতে করে হোটেলে ফিরছিলেন। রাস্তা ভুলে, ঘটনাচক্রে তাঁদের গাড়িখানি ঐখানে গিয়ে পড়ে। তাঁরা তাঁদের গাড়ি

থেকে ত্রিশ গজ দূরে দু'খানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পান। সামনের গাড়ি থেকে আরোহীদের নেমে অপর গাড়িখানিকে তাঁরা ঘেরাও করতে দেখেন। তারপরই তিনি পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ ও আগুন দেখতে পান এবং দ্বিতীয় গাড়ি থেকে আর্তনাদও শোনেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর গাড়ি থামিয়ে, ঐ গাড়ি দু'খানার দিকে ছুটে যান। তাঁর সঙ্গীরাও তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। তিনজন লোককে সেখানে তিনি চালকের আসনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন, এবং অন্য তিনজন যারা মমতাজকে টেনে নামাচ্ছিল, তারা তাঁকে ছুরি উঁচিয়ে ভীতি প্রদর্শন করছে তাও তিনি দেখতে পান। তিনি একেবারে তাদের সামনে এসে পড়লে, গাড়ির সম্মুখে দণ্ডায়মান তিনজনের একজন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে, অপর জন তাঁকে ছুরিকাঘাত করে। যে তিন-জন মমতাজকে নিয়ে যাচ্ছিল, তাদের দু'জনকে তিনি টেনে আনেন এবং তৃতীয় ব্যক্তিকে হটিয়ে মমতাজকে নিজের গাড়িতে তোলবার চেষ্টা করেন। মমতাজকে তাঁর গাড়িতে নিয়ে যাবার সময় এক ব্যক্তি পুনরায় তাঁকে গুলি করে। তিনি মমতাজকে ছেড়ে উক্ত লোকটিকে আক্রমণ করতে যান এবং লোকটির নিকটবর্তী হ'লে অপর আর একজন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। তিনি প্রথম আততায়ীর কাছাকাছি হলে, তাঁর গাড়ির দিক থেকে আবার চীৎকার শুনতে পান এবং ফিরে দেখেন, দু'জন লোক পুনরায় মমতাজকে আক্রমণ করেছে। এই দুই আততায়ীর মধ্যে একজনের হাতে কুকৃরি ছিল, সাক্ষী সেটা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। গাড়িতে আলোগুলো জ্বালা ছিল। সাক্ষী পথের বাঁধানো সানের উপর পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত যুঝে ছিলেন। তিনি উঠে দেখতে পান, মহিলাটিকে তাঁর গাড়ির পিছনের আসনে বসানো হয়েছে, এবং যে লোকটা সর্বপ্রথম

তাঁকে গুলি করেছিল, সে তখনো গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তার কাছে এগুবার চেষ্টা করতেই সে পুনরায় গুলি ছুঁড়তে থাকে। তারপর লোকটা ছুটে পালায়। সাক্ষী তখনো দ্বিতীয় গাড়িটার পেছনে দু'তিন জন লোককে দেখতে পেয়ে তাদের দিকে এগিয়ে যান। তাদের কাছে ছোরা ছিল, তাই দিয়ে তারা আরোহীদের আক্রমণ করে। সাক্ষী তাদের একজনকে ধরে ফেলেন। তাঁর সঙ্গে যখন আক্রমণকারীর ধস্তাধস্তি চলেছে, তখন আবার গাড়ি থেকে চীৎকার শুনেই তিনি ফিরে দেখেন, দু'জন লোক মহিলাটিকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। ইতো-মধ্যে আক্রমণকারীদের গাড়িখানিকে তিনি চলতে দেখেন এবং তাতে কয়েকজন লোক উঠে পড়ে। তিনি দৌড়ে তাঁর নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে গিয়ে গাড়ির ভেতর থেকে দু'জন দুর্বৃত্তের একজনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন, এবং অপর ব্যক্তির হাতে যে পিস্তল ছিল সেটা ছিনিয়ে নেন। আবার ধস্তাধস্তি সুরু হয়। ওদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া কুকৃরিটাও তখন তাঁর হাতে। সেইটার সাহায্যে তিনি একজনকে জখম করেন এবং পিস্তলধারী লোকটাকে পাকড়াও করেন। কঃ ভিকার্স এবং অপর দুই কর্মচারী সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এসে যাওয়ায় লোকটাকে আয়ত্তে আনা হয়। তাঁর ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে তিনি অপর আহত ব্যক্তির নিকট গমন করেন,—যাকে আক্রান্ত গাড়িটির নিকট রাস্তার উপর ইতঃপূর্বেই পড়ে থাকতে দেখেছিলেন, তাঁর কাছে। পরে তিনি তাঁকে মিঃ বাওলা বলে জানতে পারেন। যে লোকটাকে তাঁরা পাকড়াও করে-ছিলেন, তাকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করা হয়। তারপর তিনি সেণ্ট জর্জ হাসপাতালে গমন করেন। সেখানে তাঁকে দশ দিন চিকিৎসাধীন থাকতে হয়। প্রথম আসামী সফী আমেদ, ইন্দোরের অশ্বারোহী পুলিস-

বাহিনীর রিসালদার, যাকে তাঁরা ধরেছিলেন, এবং পঞ্চম আসামী রামরাও দিঘে, ইন্দোর বিমান-বাহিনীর ক্যাপ্টেন যাকে তাঁরা গাড়ির ভেতর থেকে টেনে বার করেন—এই দু'জনকে সাক্ষী সনাক্ত করেন। বৃটিশ কর্মচারীদের হাতে অস্ত্র বলতে ছিল কেবলমাত্র লেঃ বেট্‌লির গল্‌ফের ষ্টিক্‌।

লেঃ বেট্‌লি এবং কঃ ভিকার্স লেঃ সেগার্টের কাহিনী স্বীকার করেন এবং উদ্ধারকার্যে নিজ নিজ অংশের খুঁটিনাটি বর্ণনা করেন। যদিও এই সকল সাক্ষীদের আসামী পক্ষের কৌঁসিলীর সুদীর্ঘ কঠোর জেরার সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু তাতেও ঘটনার পরিষ্কার বিবরণ এবং তাঁদের বীরত্ব-কাহিনী কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি।

স্বভাবতই এই মামলায় দেশের সর্বত্র একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, বিশেষ করে বোম্বাইয়ে, যেখানে বাওলা একজন বিখ্যাত নাগরিক বলে পরিচিত ছিলেন, এবং যেখানে ইন্দোরের মহারাজার প্রভূত সম্পত্তি ছিল,—সেখানে এই ধরনের ঘটনা যে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবে সে আর বিচিত্র কি! সংবাদপত্রগুলি, বিশেষ করে 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া' ফলাও করে এই মামলার শুনানি-প্রচারে তৎপর হয়ে উঠেছিল। মামলাটিকে এবং ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীদের বিশেষ প্রাধান্য দেওয়ায় কাগজগুলি আসামী পক্ষের বিরাগভাজন হয়েছিল।

আসামী পক্ষের কৌঁসিলী মিঃ জিন্না 'টাইমস্' পত্রিকার উপর রুল জারী করার জন্য বিচারপতির নিকট এই মর্মে এক আবেদন করেন যে, 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া' পত্রিকাখানি মামলাটিকে অযথা প্রাধান্য দিয়ে এবং ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষ্যের উপর মন্তব্য প্রকাশ করে আদালতকে অবমাননা করেছে। এ্যাডভোকেট জেনারেল এবং বিচারপতি যে-

সকল বিবরণ এ ক্ষেত্রে নিষ্ফল উল্লেখ করেছেন,—যেমন মমতাজের শিশুটি মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, অথবা পরে সেটিকে হত্যা করা হয়েছিল, সংবাদপত্রটি সেই সকল বিবরণের উপর মন্তব্য প্রকাশ ক'রে আসামী পক্ষের প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেছেন। সংবাদপত্র কেবলমাত্র ঘটনা পরিবেশন করতে পারে,—আদালতে মামলা নিষ্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সাক্ষ্য-বিবরণের উপর মন্তব্য প্রকাশ করা অন্যায় ও রীতিবিরুদ্ধ এবং জুরিগণও এতে পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারেন।

মিঃ জিন্নার আবেদন ও প্রশ্নের উত্তরে বিচারপতি মিঃ ক্রম্প এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, সংবাদপত্র কেবলমাত্র ঘটনা ও সাক্ষ্য-বিবরণীর উপর টীকা-টিপ্পনী করলে তা দূষণীয় হবার কারণ নেই। সংবাদপত্রে যদি আসামীরা দোষী বা নির্দোষ এরূপ কোন ইঙ্গিতের প্রয়াস না থাকে, তা'হলে তাকে বিধি-বিরুদ্ধ বলা যায় না। এই মামলার সাক্ষ্য প্রভৃতির উপর সংবাদপত্রের মন্তব্যগুলি নিন্দনীয় হলেও, তাতে আদালতের বিচার সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত তিনি দেখতে পাননি। বিচারপতি মিঃ জিন্নার আবেদন সম্পর্কে চিন্তা করবার এবং প্রয়োজন হলে রুল জারী করারও প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু পরে এ ব্যাপারে আর কিছুই হয়নি।

ফরিয়াদী পক্ষের পূর্ণ বিবৃতি ও সাক্ষ্য গৃহীত হয়ে যাবার পর আসামী পক্ষের শুনানি আরম্ভ হয়। প্রথম আসামী তার জবানবন্দীতে বলে: সে তার খুল্লতাতের অনুরোধে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি তাকে দু'খানি হাজার টাকার নোট দিয়েছিলেন—তাঁর মেয়েকে বিবাহ করতে হবে বলে। তারপর সে বোম্বাইয়ে উপস্থিত হয়ে, তার বন্ধু ফলের ব্যবসায়ী লতিফের খোঁজ করে। বন্ধুর দেখা না পেয়ে

সে বোম্বাইয়ের সুর্যাস্ত দেখবার অভিপ্রায়ে হ্যাঙ্গিং গার্ডেনে যায়। সেখান থেকে ফেরবার পথে সে চীৎকার শুনে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে একজন মহিলাকে একজন লোক আক্রমণ করছে দেখে। সে লোকটিকে ধরে ফেলে এবং তার কবল থেকে মহিলাটিকে উদ্ধার করে। সে লোকটিকে ধরে থাকতে থাকতে একজন ইউরোপীয়ান এসে লোকটিকে টেনে নিয়ে তাকে ভূতলশায়ী করে। পরে অপর একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক তাকে আক্রমণ করে এবং আর একজন ইউরোপীয়ের সাহায্যে তাকে বেঁধে ফেলে। উক্ত মহিলার উপর সত্যকার আক্রমণকারীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যে ছোরাখানা তার কাছে ছিল, সেটা তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। তারপর তাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিছুদিন পরে ইনস্‌পেক্টার জেফরিস্‌ চার পাঁচ জন ইন্দোরবাসীকে দেখিয়ে তাকে বলে যে, তারা সকলেই তার দলের লোক, সুতরাং তাকে সত্যি কথা বলতে হবে। সে ইনস্‌পেক্টারকে বলে যে, সে নির্দোষ।

বিচারপতি আসামীকে জিজ্ঞাসা করেন, মমতাজ কেন একজন নির্দোষ পথচারীকে এই অভিযোগে জড়িত করবে?

উত্তরে আসামী বলে, সে তা বলতে পারে না।

আসামী পাণ্ডে বলে যে, সে কোন দিনই অরোরা হাউসে বাস করেনি। কলেজে যোগদান করার জন্য ডিসেম্বর মাসে ছুটি পেয়ে সে পুণাতে আসে। সেখানে সে তার ছোট ভায়ের বিয়ের সংবাদ পায়। সেই সুত্রে ১১ই জানুয়ারী পুণা ত্যাগ করে, ১২ই তারিখে ইন্দোরে উপস্থিত হয়। হত্যাকাণ্ডের দিন সে বোম্বাইয়ে ছিল না। লেঃ বেট্‌লি তাকে নিতান্ত ভুলক্রমে সনাক্ত করেছেন। সে তার লেখাপড়াতেই

লিপ্ত থাকতে চায়। জীবনে কখনো সে পিস্তল ব্যবহার করেনি, কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবার কল্পনাই তার ছিল না বা লিপ্ত সে হয়নি। সে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

বিচারপতির প্রশ্নের উত্তরে আসামী পাণ্ডে আরো বলে যে, পুণাতে থাকবার সময় সে ফান্সীর কাছ থেকে কোন টেলিগ্রাম পায়নি। সে জানায় যে, সে ইন্দোর রাজ-কর্মচারীদের কেউ নয়, অথবা রাজকীয় বিভাগের কোন ভার তার উপর নেই। সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। ম্যাক্স্‌ওয়েল গাড়িখানা কেনবার সময় সে ফান্সীর সঙ্গে গিয়েছিল; ফান্সী তাকে বলেছিল যে, তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য সে গাড়ি কিনছে। ফান্সী ও আসামী একসঙ্গে বোম্বাই ও পুণাতে থাকাটা আকস্মিক ঘটনামাত্র। আসামী ফান্সীর কাছ থেকে জানতে পারে যে, মমতাজ ইন্দোর ফিরে যেতে ইচ্ছুক, এবং এ ব্যাপারে নওনজান ও বাচুবাঈ মধ্যস্থতা করছে।

তৃতীয় আসামী ম্যাক্স্‌ওয়েল গাড়ির ড্রাইভার ব'লে বর্ণিত বাহাদুর শা বলে: ইন্দোর ষ্টেটের মোটর-ড্রাইভারের কাজে ইস্তফা দেবার পর সে আর কখনো বোম্বাই যায়নি।

পঞ্চম আসামী ক্যাপ্টেন দিঘে বলে: সে বোম্বাইয়ে ছিল না এবং হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কিছুই জানে না। সে নিশ্চয় ক'রে বলতে পারে যে, যে বৃটিশ কর্মচারী তাকে সনাক্ত করেছেন, তিনি ভুল করেছেন—যেহেতু সনাক্তকরণের সময় আসামীদের সারিতে আসামীরই একমাত্র দাড়ি কামানো ছিল।

আসামীর দেহে আঘাতের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে যে, মরুভূমিতে সাইকেল চালাবার সময় পড়ে যাওয়ায় তার দেহ ছড়ে যায় এবং ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে একটা আঙুল সে কেটে ফেলে।

ষষ্ঠ আসামী, ইন্দোরের পুলিস সাব-ইনস্পেক্টার মোমতাজ মহম্মদ বলে যে, হত্যাকাণ্ড যেদিন সংঘটিত হয়, সেদিন সে ইন্দোরে তার রুগ্ন পুত্রের পরিচর্যায় রত ছিল। তার অনুপস্থিতিতে তার গৃহে খানাতল্লাসী করা হয়।

সপ্তম আসামী আবদুল লতিফ বলে যে, সে ইন্দোরে নীলামে-কেনা একটি গাড়ি নিয়ে ব্যস্ত ছিল, এবং তার পায়ে ক্ষত-চিহ্ন জুতার দোষে হয়েছিল।

অষ্টম আসামী, ইন্দোর ইম্পিরিয়াল লান্সারের সার্জেণ্ট কেরামৎ খাঁ বলে: হত্যাকাণ্ডের দিন সে বোম্বাইয়ে ছিল না। এক সময় তার বন্ধুর সঙ্গে শিকার করতে গিয়ে পায়ে বন্দুকের গুলি লাগে। তার কাঁধে ও হাতে আঘাত লেগেছিল গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে গিয়ে। তার বাড়িতে খানাতল্লাসীর প্রাপ্ত ৯৪৫৲ টাকা সম্বন্ধে আসামী বলে, সে টাকার মধ্যে ৬০০৲ টাকা তার ভাইয়ের এবং বাকীটা তার নিজের।

নবম আসামী, ইন্দোর ষ্টেট-বাহিনীর য়্যাড্‌জুটেণ্ট, আনন্দরাও ফান্সীর উক্তি থেকে জানা যায় যে, শঙ্কররাও তার বন্ধু, আত্মীয় এবং ইন্দোরের হাউসহোল্ড মিনিষ্টার। মমতাজ ইন্দোর ত্যাগ করার পর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়, ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে। লোকে মনে করে, মমতাজ চলে যাওয়ার জন্য তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আগষ্ট মাসে শঙ্কররাও আসামীকে বলে সে যেন মমতাজকে ইন্দোরে ফিরে আসতে অনুরোধ করে। অক্টোবর মাসে সে বোম্বাইয়ে আসে প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধক্রমে। সেখানে এসে আসামী আবদুল করিম নামক একজন লোক মারফৎ মমতাজকে খবর পাঠায়। তার উত্তরে মমতাজ জানায় সে যেতে ইচ্ছুক এবং আসামীকে গাড়ি খরিদ করতে বলে। তখন আসামী

গাড়ি কেনে। পরে আসামী জানতে পারে যে, মমতাজের যাবার সুযোগ তাড়াতাড়ি হবে না, সুতরাং তারা গাড়িখানি ইন্দোরে পাঠিয়ে দেয়। জানুয়ারীর ছয় বা সাত তারিখে সে ইন্দোরে একটা টেলিগ্রাম পায়, কিন্তু সে তার অর্থ বুঝতে পারেনি। মমতাজকে বে-আইনিভাবে নিয়ে যাবার ধারণা তার ছিল না।

সে তার সারা জবানবন্দীতে মমতাজকে কমলা বাঈ সাহেবা বলে উল্লেখ করে।

উভয় পক্ষের জবানবন্দী সাক্ষ্য প্রভৃতি গৃহীত হবার পর এ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল জুরিগণকে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বর্ণনা করেন—কালানুক্রমে যে সকল অভিযোগ ফরিয়াদী পক্ষ প্রমাণ করেছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, প্রমাণের দ্বারা এ কথা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয়েছে যে, মমতাজ দশ বৎসর পূর্বে ইন্দোর মহারাজের রক্ষিতা হিসাবে গৃহীত হয়েছিলেন ; কমলা বাঈ নাম ধারণ করে ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত তিনি মহারাজার রক্ষিতাই ছিলেন। উক্ত সময় মুসৌরী যাবার পথে দিল্লিতে পৌঁছবার পর তিনি আর অগ্রসর হতে অস্বীকার করেন। দিল্লি থেকে হত্যাকাণ্ডের দিন পর্যন্ত মমতাজের গতিবিধির সম্পূর্ণ বিবরণ দেন এ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল, এবং ঐ সময়ের মধ্যে আসামীদের ক্রিয়াকলাপের কথাও জুরিদের বর্ণনা করেন। এই সময়ে তিনি যাকাউল্লা অমৃতসরে মমতাজকে যে ভীতি-প্রদর্শন করেছিল, তারও উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, উক্ত সময় মমতাজকে বলা হয়েছিল যে, যদি সে স্বেচ্ছায় ইন্দোর না যায় তা'হলে অন্য পন্থা অবলম্বন করা হবে। তিনি অতঃপর আসামী পাণ্ডের ছুটির দরখাস্তের

কথা উল্লেখ ক'রে বলেন যে, আসামী উক্ত দরখাস্তে বলে, সে চিকিৎসকের উপদেশ-মত বায়ু-পরিবর্তনে যাবে, কিন্তু প্রথম আসামীর জবানবন্দী থেকে জানা যায়, সে তখন তার ভগিনীর সেবা করছিল—তাকে বোম্বাইয়ে দেখতে পাওয়া যায়।

ফান্সী ১৬,০০০৲ টাকা ধার ক'রে বোম্বাইয়ে পাণ্ডের সঙ্গে ম্যাক্স্‌ওয়েল গাড়ি কেনে, এবং এই গাড়ি কেনাটাই হ'ল মমতাজকে হরণ করার পৃথক ব্যবস্থা। পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম আসামী ছাড়া অন্যান্য আসামীরা যাকাউল্লা সমেত অক্টোবর মাসে বোম্বাইয়ে ছিল এবং মমতাজের মামা আল্লাবক্সের সহযোগিতা আদায় করেছিল,—মমতাজকে হরণ করার ব্যাপারে। আল্লাবক্স ছিল ট্যাক্সী-চালক। অক্টোবর মাসে গাড়ি কেনার সময় আল্লাবক্স ফান্সীর সঙ্গে ছিল, এ কথা ফান্সী তার জবান-বন্দীতে স্বীকার করেছে।

এ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল তাঁর বক্তৃতা-প্রসঙ্গে জুরিদের বলেন যে, প্রমাণের দ্বারা এটা সিদ্ধ হয়েছে যে, আক্রমণকারীরা তিনটি পিস্তল, একটি কুকৃরি ও একটি ছোরায় সজ্জিত ছিল, এবং তাদের অভিপ্রায় ছিল মমতাজকে বল-প্রয়োগে হরণ করা। অতঃপর এ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল বৃটিশ কর্মচারীদের সাক্ষ্যের উল্লেখ করে বলেন, এঁদের সাক্ষ্য থেকে প্রমাণ হয় যে, একজন আসামী মিঃ সেগার্টকে গুলি করে এবং অপর একজন তাঁকে ছোরা মারে। তারপরও তিনি সাহসিকতার সঙ্গে মমতাজকে আততায়ীদের হাত থেকে রক্ষা করেন। তারপর তৃতীয় আসামী পাণ্ডে মিঃ বেট্‌লিকে গুলি করে।

কৌঁসিলী বৃটিশ কর্মচারীদের সনাক্ত সময়ের সাক্ষ্য সম্পর্কে খুঁটিনাটি আলোচনা করার পর প্রতিবাদী পক্ষের সাক্ষ্য সম্বন্ধে বলেন যে, প্রতিবাদী

পক্ষ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল যে, মমতাজ ইন্দোরে ফিরে যেতে ইচ্ছুক ছিল, তার সম্মতিও ছিল, সুতরাং কোন অপরাধ সংঘটিত হয়নি। এ ব্যাপারে মমতাজকে কঠোর জেরার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, দু'দিন ধরে। তিনি অত্যন্ত সহজ ও সরলভাবে সাক্ষ্য দেন এবং বিনা দ্বিধায় সকল প্রশ্নের জবাব দেন। সত্যবাদী সাক্ষী হিসাবে তাঁর সাক্ষ্য সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য। মহারাজের কাছে ফিরে যাওয়ার যদি সত্যিকার ইচ্ছাই মমতাজের থাকত, তা'হলে তাঁর যেতে কোথায় বাধা ছিল—অমৃতসর থেকে ইন্দোর বা মুসৌরী? মমতাজের স্বেচ্ছায় ইন্দোর ফিরে যাওয়ার কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং দুরভিসন্ধিপূর্ণ।

উপসংহারে এ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল জানান, জুরিগণকে এ কথা বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে যে, যে-মমতাজের সঙ্গে মহারাজের মনান্তর ঘটেছিল, সেই মমতাজ তাঁর কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছুক! এ কথা কি বিশ্বাস করা সম্ভব যে, মমতাজকে নিয়ে যাওয়া হ'লে যে সকল পদস্থ ষ্টেট্ কর্মচারী বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত, তাদের মুক্তি দেওয়া হ'ত? এটা কি আকস্মিক ঘটনা যে, চারজন আসামী ৬ই জানুয়ারী ছুটি নিয়েছিল আর অন্যান্য সকলে ৯ই ছুটি নিয়েছিল, যেদিন টেলিগ্রাম পাঠানো হয়: 'ফল পাঠানো হ'ল' বলে?—এটাও কি আকস্মিক ঘটনা যে, আসামীদের দেহে ক্ষত-চিহ্ন যা ছিল, সবই এক সপ্তাহের মধ্যে হয়েছিল? কৌঁসিলী বলেন যে, আসামীরা অপরাধ সম্বন্ধে সাক্ষ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখেন নি। তিনি জুরিদের এ কথা বিশ্বাস করতে অনুরোধ করেন যে, আসামীরা ইচ্ছা করেই গাড়িখানি লুকিয়েছে, যাতে ক'রে তা থেকে না আর কোন নতুন সূত্র আবিষ্কার হয়ে পড়ে, এই ভয়ে। তিনি আসামীদের অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য জুরিদের অনুরোধ করেন।

মিঃ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তারপর প্রথম আসামী সফী আমেদের পক্ষে জুরিদের বলেন যে, এ্যাড্ভোকেট জেনারেল জেরার কতকগুলি বিষয় উপেক্ষা করেছেন বলে তিনি বলতে চান যে, কি ভাবে প্রতিপক্ষের মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। তিনি এ বিষয় অস্বীকার করেন না যে, মিঃ বাওলাকে হত্যা করা হয়েছিল এবং লেঃ সেগার্টকে গুলি করা হয়েছিল। কে মৃত্যু ঘটিয়েছে—বিষয়টা কেবলমাত্র সে সম্বন্ধেই নয়, তার চেয়েও তুচ্ছ। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, ফরিয়াদী পক্ষ কি আসামীদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন? তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, আসামী সফী আমেদকে লেঃ সেগার্ট না ধরা পর্যন্ত সে আক্রমণে যোগ দেয়নি, সে মিঃ বাওলা বা লেঃ সেগার্ট অথবা মিঃ ম্যাথুসকে গুলি করেনি,—মমতাজকে ছুরিকাঘাতও করেনি এবং তার কাছে পিস্তল পর্যন্ত ছিল না। প্রথম আসামীর ব্যাপারে গোল বাধলো লেঃ সেগার্টের সাক্ষ্যে—যেখানে তিনি বলেছেন, তিনি আসামীর হাতে পিস্তল দেখেছিলেন। মিঃ সেনগুপ্ত বলতে চান যে, তিনি দেখিয়ে দিতেন লেঃ সেগার্টের সাক্ষের ঐ অংশ বিশ্বাসযোগ্য নয়। লেঃ সেগার্ট সাক্ষ্যে বলেন, তিনি মিঃ বাওলার গাড়িতে মমতাজকে আহত ও রক্তাক্ত দেখেছিলেন। যদি একথা সত্য বলে ধরা যায়, তা'হলে মমতাজের সাক্ষ্য সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য হয়ে যায়—তাঁর সনাক্ত গ্রহণযোগ্য নয়। মিঃ সেনগুপ্ত আরও বলেন যে, মিঃ ম্যাথুসের আসামীকে সনাক্ত করা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়, কারণ যে তাঁকে গুলি করেছিল এবং যার সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়েছিল, তাদের তিনি চিনতে পারেন নি। লেঃ সেগার্টের সাক্ষ্যেও দেখা যায় যে, আসামী মমতাজকে কুকৃরি নিয়ে আক্রমণ করেনি। আসামী যে সংঘর্ষের মধ্যে ছিল, সে বিষয়ও সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত

হয়নি। কেবল এইটুকুই প্রমাণ হয়েছে যে, সংঘর্ষের পর লেঃ সেগার্ট আসামীকে পাকড়াও করেন।

আসামীর হাতে পিস্তল দেখার অভিযোগ ছিল লেঃ সেগার্টের সাক্ষ্যে। কৌঁসিলী সে বিষয়ে জুরিদের ভালোভাবে বিচার করতে অনুরোধ করেন। কারণ তিনি বলেন যে, শেষ পর্যন্ত লেঃ সেগার্ট যখন আসামীকে ধরেন, তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে; তাছাড়া তিনি তখন নিজেও আহত। তিনি বলেছেন, আসামী মমতাজকে পিস্তলের সাহায্যে আঘাত করেছিল, কিন্তু সেটা তার ভুল; কারণ ডাক্তারী পরীক্ষায় সেটা সমর্থিত হয়নি। তাছাড়া লেঃ সেগার্টের হাতে তখন কুকরি ছিল, তিনি আসামীর হাতে পিস্তল দেখলে কুকরির সাহায্যে আঘাত করতে পারতেন, কিন্তু তা করেন নি।

কৌঁসিলী তাঁর মক্কেল প্রথম আসামীর পক্ষ সমর্থনে মন্তব্য করেন যে, তদন্ত কার্যেও গলদ দেখা যায়। কয়েকজন লোককে প্রথম আসামীকে সনাক্ত করতে বাধ্য করা হয়েছিল, এবং আসামীকে অক্টোবর ও জানুয়ারী মাসে অনেকস্থলে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল, এ-কথাও অর্থহীন। মিঃ সেনগুপ্ত তাঁর আসামীকে অব্যাহতি দেবার অনুরোধ করেন জুরিদের।

অতঃপর মিঃ ভেলিঙ্কর অন্যান্য আসামীদের পক্ষ থেকে জুরিদের এই অনুরোধ করেন যে, তাঁরা যেন এই মামলা সম্পর্কে সংবাদপত্রের টীকা-টিপ্পনী ও বিবৃতির উপর আস্থাবান হয়ে কোন ধারণা পোষণ না করেন। মামলাটি চাঞ্চল্যকর সন্দেহ নাই, কিন্তু সংবাদপত্রসেবীরা তাকে নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই হোক বা অর্থের জন্যেই হোক অধিকতর চাঞ্চল্যকর করে তুলেছেন। তিনি বৃটিশ কর্মচারীদের বীরত্ব ও সাহসিকতার

প্রশংসা করেন, এবং জুরিদেরও এ-কথা স্মরণ করিয়ে দেন যে, বীরত্ব ও সাহসিকতার মুগ্ধতা যেন তাঁদের বিচারবুদ্ধির উপর রেখাপাত না করে। সাধারণ সাক্ষীর মতই বীর ইংরেজ কর্মচারীদের সাক্ষ্যও রীতিমত পরীক্ষার পরই যে গ্রহণযোগ্য, একথা বিস্মৃত হ'লে চলবে না। জুরিদের দৃষ্টিভঙ্গী, অধিকার ও কর্তব্য প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশ্লেষণের পর তিনি তাঁর মক্কেলদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন।

কৌঁসিলীদের যুক্তি-তর্ক ও বক্তব্য শেষ হয়ে গেলে, মাননীয় বিচারপতি জুরিদের মামলাটি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেন। এবং বহু আলাপ-আলোচনার পর জুরিগণ মোমতাজ মহম্মদ ও কেরামৎ খাঁ ব্যতীত অন্য সমস্ত আসামীকেই দোষী সাব্যস্ত করেন।

এর কয়েক দিন পরে বিচারপতি রায় দান করেন। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ রায়ে আসামী সফী আমেদ, পাণ্ডে ও দিঘের ফাঁসির হুকুম দেন। জুরিগণের অভিমতের সঙ্গে একমত হয়েই তিনি মোমতাজ মহম্মদ ও কেরামৎ খাঁকে অব্যাহতি দেন এবং অন্যান্য আসামীদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড প্রদান করেন।

যেদিন রায় প্রকাশ হবার কথা ছিল, সেদিন বিচারালয়ের সম্মুখে বিরাট উৎসুক জনতা এই উত্তেজনাপূর্ণ মামলায় জুরিদের শেষ সিদ্ধান্ত ও বিচারপতির রায় শোনার জন্য সারা দিন অপেক্ষা করেছিল।

বাওলা হত্যাকাণ্ডে মমতাজের প্রণয়লীলার চাঞ্চল্যকর কাহিনী এইখানেই এক প্রকার শেষ হয় বটে, কিন্তু এই মামলার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় চতুর্দিকে এবং বহুদিন পর্যন্ত এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়। আসামীরা বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে তৎকালীন প্রিভি-

কাউন্সিলেও আপিল করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখানেও তাদের পরাজয় ঘটে—নভেম্বর মাসে তাদের আপিল অগ্রাহ্য হয়। সফী আমেদ, পাণ্ডে ও দিঘের ফাঁসি হয়ে যায়।

কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই এই মামলায় আর এক অবস্থার উদ্ভব হয়। ইতোমধ্যে বিচারের সাক্ষ্য-প্রমাণে এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, মহারাজ তুকাজীরাও হোল্‌কার মমতাজ বেগমকে হরণ করতে হয় উত্তেজিত অথবা উৎসাহিত করেছিলেন, অতএব তাঁরও বিচারের প্রয়োজন। এ ব্যাপারে ইংরেজ বিচার-বিশারদদেরও টনক নড়ে। তাঁরা পরের বছরেই তাঁদের বিচারের মানদণ্ডে একটু স্বতন্ত্রভাবে হোলকারকে নিয়ে এসে ফেলেন। মহারাজকে জানানো হয় যে, এই ব্যাপারে তাঁর সম্পর্কে একটি তদন্ত কমিশন বসানো হবে এবং তাঁর নিজের স্বার্থের জন্যেই তাঁকে কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে, অথবা সিংহাসন ত্যাগ করতে হবে।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ তুকাজীরাও হোল্‌কার সমস্ত দিক্ বিবেচনার পর শেষ পর্যন্ত মমতাজকে ভালোবাসার ফলস্বরূপ সিংহাসন ত্যাগ করেন। এইখানেই এই মামলার যবনিকাপাত হয়।

এর পরও কিন্তু শ্রীমতী মমতাজকে আমরা পাই ঠিক পূর্বের মতই হাস্যে-লাস্যে-ভরা লীলায়িত প্রণয়িনীর বেশে। বিচার-পর্ব শেষ হবার পরই তিনি চলে যান অমৃতসরে, বোম্বাই ত্যাগ করে। এবং সেখানে গিয়ে এই ক্ষত-চিহ্ন নিয়েই মনোমোহিনী রূপসী হিসাবে আর এক যুবকের হৃদয় ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ঐ যুবক স্থানীয় এক বিশিষ্ট ধনী চর্ম-ব্যবসায়ীর সন্তান।

সামসেদ বাঈ হত্যা

লাহোরের পঞ্চদশ বর্ষীয়া নর্তকী সামসেদ বাঈ হত্যাকাণ্ডের মধ্যে বহুবিধ বিচিত্র উপাদান থাকলেও, হত্যাকাণ্ডের ছ'মাস পরে বিচারকার্য শুরু না হওয়া পর্যন্ত সংবাদপত্রসেবী ও জনসাধারণের কাছে সে রহস্য অজ্ঞাতই থেকে গিয়েছিল। কেমন করে এই হত্যালীলাকে সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে রাখা হয়েছিল, সেও এক কাহিনী বিশেষ। জলের মত প্রভূত অর্থব্যয় করে, এক ধনী জমিদারকে আইনের কবল এবং হত্যাপরাধের পরিণাম থেকে বাঁচাবার জন্যে সব দিক থেকে তথ্য নষ্ট করার বহু চেষ্টা হয়েছিল বটে, কিন্তু সে অর্থব্যয় শেষ পর্যন্ত বৃথা প্রতিপন্ন হয়।

হত্যা কুখ্যাতি লাভ করে নানা কারণে—উদ্দেশ্যের বিশেষত্বে, অসামান্য উপায় অবলম্বনে, ষড়যন্ত্রের জটিলতা ও বৈশিষ্ট্যে, অথবা হত্যা করার পদ্ধতিতে। কতকগুলি নরহত্যা সাধারণের মধ্যে গুরুত্ব অর্জন করে নিহিত ব্যক্তির পদমর্যাদার জন্যে, অথবা হত্যাকারীর সম্ভ্রম বা উচ্চ পরিচিতির জন্যে।

এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে জটিলতা যদিও কিছুই ছিল না, তবু একে রহস্যজনক ক'রে তোলার জন্য বহু আইন-উপদেষ্টার কুশলী পরামর্শ ছিল

এর পেছনে। সামসেদ বাঈকে যে দাব কালানের নবাব মহম্মদ নওয়াজ খান হত্যা করেছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। সম্পূর্ণ বিদ্বেষবশেই হোক বা সাময়িক উত্তেজনাতেই হোক, এটা নিছক হত্যাকাণ্ড; যদিও বিচারের সময় নবাব জোর করে বলবার চেষ্টা করেছিলেন যে, সামসেদ বাঈকে হত্যা করার উদ্দেশ্য তাঁর মোটেই ছিল না বরং তাকে বিবাহ করার সঙ্কল্পই তিনি মনে মনে পোষণ করতেন। মহম্মদ নওয়াজ খান উক্ত সামসেদ বাঈকে হত্যা করুন বা না করুন, এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হ'ল, তিনি সেই মৃতদেহের পাশে প্রায় দীর্ঘ আট ন'ঘণ্টা শুয়েছিলেন, এবং এই মামলায় আরো অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে—পুলিস, বিচারপতি, আইন-উপদেষ্টা বা এ্যাসেসার, এঁদের কেউই এ-সম্পর্কে তদন্ত করা প্রয়োজন মনে করেন নি যে, এতখানি সময় এক রক্তাক্ত মৃত ব্যক্তির দেহের পাশে শুয়ে থাকার প্রকৃত উদ্দেশ্য তাঁর কি ছিল এবং তিনি শুয়ে কি করছিলেন।

এই মামলায় যখন মহম্মদ নওয়াজ খান দোষী সাব্যস্ত হন, তখন সংবাদপত্রসমূহ যারা এতদিন নীরব ছিল, তারা তখন প্রদেশের অন্যান্য ঐশ্বর্যশালী জমিদার সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর মর্যাদার উল্লেখ ও নানাভাবে তাঁর চরিত্রের গুণাগুণ প্রচার সুরু করে। এই মামলার রায় নিয়ে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি থেকে সাধারণ লোকের মধ্যেও মতান্তর ঘটে। চতুর্দিকে রায়ের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু আলোচনা হতে থাকে। কিন্তু মামলার শেষ পরিণতির পূর্বেই মহম্মদ নওয়াজ খান যকৃৎ-প্রদাহ পীড়ায় মারা যান এবং তার ফলে বহু লোককে নিরাশ হতে হয়। তাঁর দুর্ভাগ্যের সুবিধা নিয়ে যাঁরা প্রচুর অর্থ উপার্জনের সুযোগ পেয়েছিলেন, মহম্মদ নওয়াজের মৃত্যুতে তাঁদের অসুবিধায় পড়তে হয়।

মামলার গোড়া থেকেই মহম্মদ নওয়াজ দু'হাতে অর্থ ব্যয় করেছিলেন। এবং শোনা যায় যে, আপিল করে তাঁর পক্ষে অনুকূল রায় বার করবার জন্যেও তিনি নাকি প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত ছিলেন। এ সব তথ্য সত্য হোক আর নাই হোক, কোন রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করবার পূর্বেই লাহোরের মেয়ো হাসপাতালে মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে, সাধ্যমত মানুষের আকাঙ্ক্ষিত বহু প্রকার ভোগলিপ্সা চরিতার্থ ক'রে তিনি দেহত্যাগ করেন। সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমুক্ত অবস্থাতেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন—শেষ তাঁর এই অভিজ্ঞতা হয় যে, অর্থ সকলকে কিনতে পারে না, ঈশ্বরের হাত সবার উপরে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে জাঙ্গে নবাব মহম্মদ নওয়াজ খানের জন্ম হয়। তাঁর পিতা নবাব মেহের হক নওয়াজ খান মারা যান নওয়াজ খানের জন্মগ্রহণের কয়েক বৎসর পরে; মহম্মদ নওয়াজ তখন শিশুমাত্র। তাঁর পিতা দুই বিধবা পত্নী রেখে যান।

শিশুকাল থেকে তাঁর মা এবং সৎমা দু'জনেই তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। অত্যন্ত প্রিয়দর্শন ছিলেন তিনি এবং স্কুলেও বাল্যকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর বাল্যকালের কিছুদিন অতিবাহিত হয়েছিল এক বিখ্যাত ইউরোপীয় শিক্ষকের অধীনে। উক্ত ইউরোপীয় ভদ্রলোকের শিক্ষক হিসাবে খ্যাতি ত' ছিলই, তাছাড়া ছেলেদের সত্যিকার আদর্শ মানুষ গোড়ে তোলার দিকে তিনি যথেষ্ট নজর দিতেন ব'লে বহু সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তানদের শিক্ষা-পরিচালনার ভার দেওয়া হ'ত তাঁর উপর। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদ নওয়াজ এট্‌কিসন কলেজে ভর্তি হন। এই সুপরিচিত বিদ্যায়তনেরও আদর্শ

ছিল—উগ্রস্বভাব, অসৎ চরিত্র রাজারাজড়ার ছেলেদের ভদ্র সুধীর করবার চেষ্টা। এই বিদ্যায়তন মহম্মদ নওয়াজকে বিলক্ষণ ভদ্রলোক করার চেষ্টায় সফলই হয়েছিল, কারণ তাঁর অন্যান্য যে কয়েকটি সদ্‌গুণ ছিল, তার মধ্যে ভদ্রতা ও ভব্যতাই ছিল সবচেয়ে বড়ো—মহম্মদ নওয়াজ সকল সময়েই অসামান্য ভদ্রলোক বলে পরিচিত ছিলেন। তবে লেখাপড়ায় মোটেই ভালো ছিলেন না তিনি, এবং মাত্র সেইটাই ছিল তার সুনামের একমাত্র অন্তরায়। শিক্ষক ও সহপাঠী মহলে তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন, কারণ সব সময়েই, এমন কি তাঁর সংক্ষিপ্ত উদ্দাম জীবনের শেষ পর্যন্ত, তিনি ছিলেন হাসিতে-খুশিতে-ভরা সকলের সজ্জন বন্ধু।

পিতা নবাব মেহের হক নওয়াজের মৃত্যুর পর, মহম্মদ নওয়াজ পাঞ্জাবের একটি প্রধান জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন। তাঁর এই বিশাল জমিদারীর আয় অনেক ছোটখাটো রাজ্যের চেয়েও বেশি ছিল। এবং সেটাই ছিল উক্ত প্রদেশের একমাত্র ঐশ্বর্যশালী সম্ভ্রান্ত পুরুষানুক্রমিক জমিদারী। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর বিবাহের কথা উঠতে থাকে এবং বহু কন্যার উচ্চাভিলাষিণী মায়েদের মন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। একদিকে তিনি যেমন ছিলেন সুপুরুষ, অন্যদিকে তেমনি বিত্তশালী। জামাই করার পক্ষে এর চেয়ে বেশি যোগ্যতা আর কি থাকতে পারে মেয়েদের মা-বাপের কাছে? সুতরাং নওয়াজ যৌবন-সুলভ ভোগবিলাসে প্রমত্ত হবার পূর্বেই খ্যাতনামা মহিলাদের একজন তাঁর এক কন্যার জন্য তাঁকে জামাতা পদে বরণ করে নেবার পাকাপাকি ব্যবস্থা করেন। একদিন অত্যন্ত আড়ম্বর ও জাঁকজমকের মধ্যে পাঞ্জাবের শিক্ষামন্ত্রী ফজল-ই-হোসেনের কন্যার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে

আবদ্ধ হন মহম্মদ নওয়াজ। সে বিবাহের জলুস আজও স্থানীয় জনসাধারণ, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের মনে জাগ্রত হয়ে আছে।

জীবনে সাফল্য অর্জন করতে একজন পুরুষের পক্ষে যা কাম্য, যুবক নবাবের তা সবই ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যে অর্থের প্রয়োজন তার চেয়েও ঢের বেশি ছিল তাঁর ঐশ্বর্য। তাঁর স্ত্রীও হয়েছিলেন অশেষ গুণসম্পন্না। সেই সময়কার সব চেয়ে প্রতিপত্তিশালী ও খ্যাতিসম্পন্ন লোকের সঙ্গেই তাঁর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। তাঁর নিজের রূপ যৌবন, অর্থ সামর্থ্য প্রভৃতি সকল দিকের কথা বিবেচনা করলে, তাঁর পক্ষে কোনদিন পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী অথবা জেলা মুসলীম লীগের সভাপতি হওয়াও কিছু বিচিত্র ছিল না, এবং অনেকে তাঁর সম্বন্ধে সে ধারণাও পোষণ যে না করতেন তা নয়।

কিন্তু কালের গতিতে, অসৎ দুশ্চরিত্র বন্ধু-বান্ধবের সংসর্গে পড়ে, মহম্মদ নওয়াজ একদিন দু'দিন করে ক্রমান্বয়ে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের পথে ভেসে যেতে লাগলেন। যতই দিন যেতে লাগলো, তাঁর পদস্খলনের গতি ততই নিত্য নিম্নতরগামী হতে লাগলো—পরদার-গমন, অপরিমিত সুরাপান, জুয়ার নেশা প্রভৃতি সমাজ-বিরোধী, আত্মঘাতি উন্মাদনায় তিনি ততোধিক আত্মনিয়োগ করতে লাগলেন। জীবনের এই সকল নিম্নস্তরের ভোগলালসা প্রবৃত্তির চরিতার্থতা ছাড়া তাঁর আর কোন কাজই রইল না। শেষ পর্যন্ত তাঁর বিবাহিত জীবনও সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'ল। দুর্নীতির দুর্ভেদ্য ব্যূহের মধ্যে পড়ে গেলেন মহম্মদ নওয়াজ। এমন কি এই সময় একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেও, তার পরাঙ্মুখ পিতাকে প্রকৃতিস্থ করতে পারে নি। ধুলোর মত টাকা খরচ করে চলেছেন তখন তিনি—ছিনিমিনি খেলছেন টাকা নিয়ে। মাসে বিশ

হাজার টাকাতেও মহম্মদ নওয়াজের কুলতো না তখন। এই সব ব্যাপারে জলের মত টাকা খরচ করতে তাঁর একটুও বাধতো না। এই সময় তাঁদের প্রাচীন প্রাসাদে যে পানোৎসব এবং প্রমোদ-বিলাসের অনুষ্ঠান হ'ত, তার খরচ চালাবার জন্যে মধ্যে মধ্যে মোটা টাকার ভূসম্পত্তি বিক্রয় বা বন্ধক দিতে হ'তে লাগলো তাঁকে। জায়গা তাঁর কাছে একঘেয়ে বোধ হ'লেই প্রাচীন মোগল সম্রাটদের মত ট্রেন বোঝাই পরিচারক, পরিচারিকা, গায়ক-গায়িকা, বাদক ইত্যাদি সহ তিনি বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বেরিয়ে পড়তেন,—বেড়িয়ে বেড়াতেন। অজস্র অর্থ থাকত তাঁর সঙ্গে আর সঙ্গে থাকত নর্তকী, গায়িকা ও অন্যান্য স্ত্রীলোক যারা তাঁকে খুশি করত। তাদের জন্য দু'হাতে অপরিমেয় টাকা খরচ করতেন তিনি। এই সময় যারাই টাকার জন্য তাঁর কাছে হাত পাত্‌ত, তাদেরই তিনি স্বেচ্ছায় এই বলে দিতেন যে, 'নাও না, এ তো আমার কাছে থাকবে না, তোমার কাজে লাগে নিয়ে যাও।' এটাকে একদিকে যেমন তাঁর চরিত্রের উল্লেখযোগ্য গুণ বলা চলত, অপর দিকে তেমনি আবার এই বদান্যতাকে দোষ বললেও সে যুক্তি খণ্ডন করা শক্ত ছিল। সবচেয়ে সহজ ছিল মেয়েছেলের কথা বলে তাঁর কাছ থেকে টাকা নেওয়া। ক্রমশঃ মদ, মেয়েমানুষ আর টাকা, এই তিনটি জিনিস এমনই অপরিহার্য হয়ে গিয়েছিল তাঁর জীবনে যে—এ ছাড়া তিনি আর কিছু ভাবতেই পারতেন না।

যে বিষাদমলিন পরিণতির ফলে তাঁর জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সংক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই দুর্ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত মহম্মদের প্রকৃতি ছিল অদ্ভুত। তিনি কোন রেস্তোরাঁ বা হোটেলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই 'বয়'দের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যেত তাঁকে 'সার্ভ' করা নিয়ে। হোটেলে

বা রেস্তোরাঁয় ঢুকেই আগে তিনি উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে পরিচিত বন্ধু-বান্ধব কেউ আছে কিনা খোঁজ নিতেন, এবং কখনো বা নিজেই ঘুরে ঘুরে দেখতেন। কারুকে পেলে তাঁর আর আনন্দের অবধি থাকত না; তৎক্ষণাৎ তাকে টেনে নিয়ে আসতেন নিজের সঙ্গে পানোৎসবে যোগ দেবার জন্য। ভর-পেট তাকে নানাবিধ সুরা, খাদ্য খাইয়ে ট্যাক্সির ভাড়া হাতে গুঁজে দিয়ে গাড়িতে তুলে দিতেন। অনেক বাজে লোকের সঙ্গেও এই সূত্রে তাঁর আলাপ হয়ে গিয়েছিল। তারা বিনামূল্যে মদ্য-পানের লোভে হোটেল রেস্তোরাঁয় তাঁর জন্য অপেক্ষা করত—দেখা হ'লে খোশামুদির কথায় তাঁকে খুশি করার চেষ্টা করত। কোন কোন দিন তাদের নিয়ে হয়ত রাত্রিবাসও হয়ে যেত সেই সব হোটেলে; তারা মেয়েছেলে সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসত, সারা রাত ধরে চলত হুল্লোড় হৈ-হল্লা! দফায় দফায় চলত সুরাপান,—কারুকে এক কপর্দকও খরচ করতে দিতেন না তিনি—হাসতে হাসতে বলতেন, দুনিয়ার যত মাতাল আর হাঘরেদের সব খরচ দেবে নবাব নওয়াজ খান! এমন কি, তাঁর উপস্থিতির পূর্বে যে যা খেয়েছিল, তারও ব্যয় বহন করতেন নিজে। এ-সবে তিনি প্রচুর আনন্দ পেতেন, এবং ঠকে মজা পেতেন। খোশামুদি তিনি বুঝতেন, মোসাহেবদের বাক্‌চাতুরীও তাঁর পক্ষে বোঝার কোন অন্তরায় ছিল না, কিন্তু তবুও, এমনিই দিলদরিয়া খরচের মেজাজ হয়ে গিয়েছিল তাঁর, যা থেকে তিনি আর ফিরতে পারতেন না—ঐ সব নিয়েই ডুবে থাকতেন সারা দিনরাত।

ক্রমশঃ এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য তাঁর স্ত্রীর পক্ষে তাঁর সঙ্গে সাংসারিক সম্পর্ক রাখা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম পত্নীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আইনতঃ ছিন্ন হয়। এবং এর

কিছু কাল পরে তাঁর দ্বিতীয় পত্নীও মারা যান। সহজ মৃত্যুই তাঁকে অব্যাহতি দেয় এই যথেচ্ছাচারী স্বামী নামধারী পুরুষের হাত থেকে।

এরই কিছু কাল পরে ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। ভারতেও তার উত্তাপ অনুভূত হয়। প্রথম পত্নীর বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং দ্বিতীয়বার পত্নীবিয়োগ তাঁকে বেশ খানিকটা অভিভূত করে ফেলে,—তিনি যুদ্ধের প্রারম্ভেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীবন যাপনের জন্য সৈন্য-বিভাগে যোগ দিয়ে রাজ-সনদ লাভ করেন। সৈন্য-সংগ্রহ বিভাগে তাঁর কাজ হয়। এই কাজের মধ্যে তিনি জীবনে একটা নতুন প্রেরণার আস্বাদ পান। নতুন পরিবেশের মধ্যে, উত্তেজনার মধ্যে, নিজেকে ডুবিয়ে রেখে তিনি হয়ত আশা করেছিলেন, তাঁর জীবনের এই নব-পরিবর্তন তাঁকে সুরা ও কামিনী, পতন ও বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে। কিছুদিন ধরে এই সকল দুষ্কর্মের বিভীষিকা তাঁর কাছে খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। দিনের-পর-দিন, সপ্তাহের-পর-সপ্তাহ, মাসের-পর-মাস গ্যালন গ্যালন হলাহল শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে, ক'জন লোক দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবার আশা করতে পারে! কেউ এমন নীলকণ্ঠ মহাপুরুষ থাকলেও হয়ত থাকতে পারেন, কিন্তু বিরাম-হীন কারণ-পানের এই প্রতিক্রিয়া মহম্মদ নওয়াজের শরীরকে ইতোমধ্যেই ভেঙে এনেছিল। ক্রমশঃ স্পষ্টই তিনি বুঝতে পাচ্ছিলেন যে, তাঁর শারীরিক ক্ষমতা আস্তে আস্তে কমে আসছে—মোটা, মাংসল, থলথলে হয়ে যাচ্ছে তাঁর শরীর, এবং বয়স অপেক্ষা বেশিই বৃদ্ধ দেখাচ্ছে তাঁকে। ক্রমশঃ কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা এমনই দাঁড়ায় যে ডাক্তার, হাকিম এবং যৌনবিশেষজ্ঞদের হাতে তাঁর প্রাণশক্তি জিইয়ে রাখার ভার তুলে দিতে হয় তাঁকে।

এর পর আমাদের ঘটনার পট-পরিবর্তিত হয় লাহোরে। ১৯৪১ সালের ২৩এ অক্টোবর মহম্মদ নওয়াজ লাহোরে যান চিকিৎসার জন্য এবং ফেলেটির হোটেলে গিয়া ওঠেন। ঘটনাচক্রে সেই সময় সামসেদ বাঈ নামে পঞ্চদশ বর্ষীয়া এক বালিকা নর্তকীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। অল্প বয়সেই নৃত্যকলায় বিশেষ গুণসম্পন্না এই সুন্দরী বালিকা বান্ধবীর আকর্ষণে মহম্মদ নওয়াজ এমনই মুগ্ধ হন যে, তিনি তাকে সম্পূর্ণ একটি রাত্রি তাঁর কাছে থাকার জন্য অনুরোধ করেন। ৬ই নভেম্বর সামসেদ বাঈ তাঁর অভিলাষ পূর্ণ করেন। সেই রাত্রের সুখানুভূতিতে অভিভূত নবাব মহম্মদ নওয়াজ তাকে মুক্ত হস্তে সতর শ' টাকা উপঢৌকন দেন এবং সেই সময়ই সামসেদ বাঈকে তাঁর সঙ্গে মুলতান জেলায় তাঁদের গ্রাম্য জমিদারী থান বাহাতুরগড়ে যাবার জন্য আমন্ত্রণ করেন।

সাধারণতঃ পয়সার প্রতি মমতা বা লোভ পুরুষের চেয়ে মেয়েদের বহুলাংশে বেশি। বিশেষ ক'রে যেন-তেন-প্রকারেণ পয়সা রোজগারই যে-সব মেয়েদের একমাত্র লক্ষ্য, তাদের পক্ষে এই রকম একজন ধনীর দিলদরিয়া মেজাজের ছেলেকে হাতের মধ্যে পাওয়া ত' সৌভাগ্যেরই বলতে হয়। বিবিজান সামসেদ বাঈয়ের বয়স অল্প হলেও, সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর এই আমন্ত্রণকে তিনি পায়ে ঠেলতে পারেন নি—মহম্মদ নওয়াজের আহ্বান তিনি গ্রহণ করেন অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে।

তুই স্ত্রীকে হারাবার পর, এমন একটি মনোমত অল্পবয়সী চটুলচপল সুকুমারীকে হাতের মধ্যে পেয়ে মহম্মদ নওয়াজ আর সময় নষ্ট করতে চাইলেন না। পরের দিনই সদলবলে তাঁরা যাত্রা করবেন স্থির করলেন। সামসেদ বাঈয়ের একটি ছোট ভাই ছিল, সেও এই যাত্রায় দিদির সঙ্গে যাবে বলে স্থির হ'ল। যথা সময়ে পরের দিন সন্ধ্যার ট্রেনে মহম্মদ

সামসেদ বাঈ হত্যা

নওয়াজ, সামসেদ বাঈ, তার ছোট ভাই তালিব হোসেন ও তাদের দু'জন ভৃত্য সমেত তাঁরা মুলতান রওনা হলেন। দু'জন চাকর ছাড়া আর সকলেই ছিল প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। ৮ই নভেম্বর ভোর চারটার সময় ট্রেন যখন খানা খানেওয়াল এসে পৌছল, তখন মহম্মদ নওয়াজ তাঁর শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে, খান বাহাদুরগড়ে না গিয়ে জাঙ্গে তাঁদের নিজেদের বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। খানেওয়ালে ট্রেন বদল ক'রে তাঁরা শেষ পর্যন্ত সদলবলে জাঙ্গেই এসে উপস্থিত হন বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটার সময়।

জাঙ্গে তাঁর সেই পৈত্রিক প্রাসাদে তখন থাকতেন তাঁরই নামীয় এক জ্ঞাতি এবং উত্তরাধিকারী মহম্মদ নওয়াজ। এঁকে এস্থলে দ্বিতীয় নওয়াজ ব'লে অভিহিত করলে আমাদের আর কোন গণ্ডগোল হবার সম্ভাবনা থাকবে না। সেই দলবল যখন লাহোর থেকে জাঙ্গে এসে উপস্থিত হ'ল, তখন এই দ্বিতীয় নওয়াজ খুব খুশি হননি এবং তা হবার কথাও নয়। ইতঃপূর্বে প্রথম নওয়াজ সম্পর্কে অনেক কথাই দ্বিতীয় নওয়াজের কানে এসেছিল, এবং তাঁর এই উদ্দাম জীবনযাত্রা—জমিদারী বন্ধক, বিক্রয় ও অর্থের অপব্যয় তিনি মোটেই সমর্থন করতেন না। কাজেই প্রথম নওয়াজ এইভাবে বাইরের একজন নর্তকী স্ত্রীলোককে নিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হলে, দ্বিতীয় নওয়াজ নিজের সম্মান রক্ষার্থে প্রাসাদ ছেড়ে দিয়ে, বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে এক তাঁবুতে এসে আশ্রয় নেন।

এর পরের ঘটনা আদালতে সাক্ষীসাবুদের এজাহারের মধ্যে যা পাওয়া যায়, এখানে আমরা প্রথমে তারই বর্ণনা করছি। সকলের এজাহার থেকে জানা যায় যে, মহম্মদ নওয়াজ আর সামসেদ বাঈ

প্রথম এসে সেদিন বিকাল প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত বৈঠকখানাতেই থাকেন, তারপর রাত হলে বিশ্রাম করার জন্য তাঁরা উভয়ে শয়নকক্ষে গমন করেন। ঐ শয়নকক্ষেই তাঁদের রাত্রের আহার্য পরিবেশন করা হয়। মহম্মদ হোসেন নামক যে পুরাতন ভৃত্য তাঁর সঙ্গে লাহোরে গিয়েছিল এবং সেখানে থেকে তাঁরই সঙ্গে ফিরেছিল, অধিক রাত্রে তাকেও তিনি ছুটি দিয়ে দেন। প্রাসাদের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত সার্ভেন্ট-কোয়ার্টারে হোসেন গিয়ে আশ্রয় নেয়।

আদালতের বর্ণিত কাহিনী থেকে আরও জানা যায় যে, গামান নামক তাঁর আর এক ভৃত্য যে রশুইখানার কাছেই ঘুমিয়েছিল, মধ্য-রাত্রে 'মহম্মদ হোসেনকে বোলাও' এই চীৎকারে তার ঘুম ভেঙে যায়। গামান মহম্মদ হোসেনকে ডাক দেয় এবং সে ও মহম্মদ হোসেন তাঁর শয়নকক্ষে গিয়ে দেখে, তাদের প্রভু মহম্মদ নওয়াজ সামসেদ বাঈয়ের সঙ্গে শুয়ে আছেন, কিন্তু বালিশ ও বিছানা রক্তে রক্তাক্ত! মেঝের উপরও রক্তের নদী ব'য়ে চলেছে এবং একটা রিভলবার পড়ে রয়েছে সেখানে! অভাবনীয় এই দৃশ্য দেখে তারা উভয়েই হতভম্ব হয়ে যায় এবং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ খবর দেয় দ্বিতীয় মহম্মদ নওয়াজকে। দ্বিতীয় মহম্মদ নওয়াজ এই খবর শোনা মাত্র চলে আসেন বটে, কিন্তু বাইরে থেকেই এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে আর সাহস করেন না। ঘরের ভিতরকার ম্লান বিজলী বাতির আলোতেই সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। দ্বিতীয় নওয়াজ হোসেন তৎক্ষণাৎ মনোহরলাল নামক স্থানীয় এক উকিলের বাড়ি লোক পাঠিয়ে দেন খবর দিতে।

সেই রাত্রেই ঘটনাস্থলে মনোহরলাল এসে উপস্থিত হন। কিন্তু

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তিনিও ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে সাহসী হন না, জানালা থেকেই অনুসন্ধান করে সোজা চলে যান ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এবং সেখান থেকে পুলিস সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের বাড়িতে। দ্বিতীয় নওয়াজ এবং মহম্মদ হোসেনও তাঁকে অনুগমন করে। পুলিস সুপারিন্‌-টেন্‌ডেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর তাঁরা অবিলম্বে স্থানীয় ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গেও দেখা করেন এবং ঘটনাটি যথাযথ বিবৃত করেন তাঁর কাছে। পরে এ কথা জানা যায় যে, জেলার এই সব পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্য ছিল, যদি সম্ভব হয় ব্যাপারটা চেপে যাওয়া। কিন্তু এ উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে তখন প্রকাশ করা হয়নি।

তাঁরা তারপর স্থানীয় থানায় গিয়ে তাঁদের বিবৃতি দাখিল করেন রাত্রি প্রায় সাড়ে তিনটের সময়। উক্ত বিবৃতিতে বলা হয়েছিল যে, 'মনোহরলাল মহম্মদ নওয়াজ খানের বাড়িতে গিয়ে ঘরের বাইরে থেকেই ব্যাপারটা অনুসন্ধান করেন। মহম্মদ নওয়াজকে ডাকাডাকির পর প্রশ্ন করায়, তিনি তাঁকে মাত্র এই কথা বলেন যে, সামসেদ বাঈ মারা গেছে।' এ-সম্বন্ধে আর কোন বিবরণ ছিল না। এই বিবৃতিতে আরো একটি কথা বলা হয়েছিল যে, 'মহম্মদ নওয়াজ তখনও সামসেদ বাঈয়ের সঙ্গে এক বিছানায় শুয়েছিলেন।'

পুলিস সাব্‌-ইন্‌সপেক্টার আলি হাসেন উপস্থিত ব্যক্তিগণের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন সওয়া পাঁচটার সময়। মহম্মদ নওয়াজ তখনও সেই একইভাবে সামসেদের পাশে শুয়েছিলেন এবং একটি রিভলবার মেঝেতে পড়েছিল। একটি কম-বাতির বিজলী আলো তখনও জ্বলছিল ঘরটিতে। সাব্‌-ইন্‌সপেক্টার রিভলবারটা তুলে পরীক্ষা ক'রে দেখেন। রিভলবারটা দেখে বেশ বোঝা যায় যে, অল্প

সময়ের মধ্যেই গুলি ছোঁড়া হয়েছে তা থেকে। ছ'টি কার্তুজের মধ্যে তখনও চারটি রয়েছে তার মধ্যে, বাকী দু'টি খরচ হয়েছে। 'ফায়ার প্লেসের' পাশে গুলি-ভরা একটি রাইফেল খাড়া করা ছিল, এবং স্যুট-কেশের মধ্যেও গুলি-ভরা অপর একটি পিস্তল পাওয়া গেল। বিছানার ধারে মাথার কাছে ছিল দুটো ছোট ছোট টেবিল। সাধারণতঃ জলের গ্লাস, এ্যাশট্রে প্রভৃতি রাখার জন্য যে ধরনের টেবিল ব্যবহৃত হয়।

পুলিসের উপস্থিতিতেও মহম্মদ নওয়াজের কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। তিনি তখনও, তেমনিই, সেই যুবতী নর্তকীর রক্তাক্ত মৃতদেহের পাশেই শুয়েছিলেন। রাত্রের অন্ধকার কেটে গিয়ে দিনের আলো ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে—যা ছিল অস্পষ্ট ক্রমশঃ তা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সকাল প্রায় ছ'টার সময় এলেন ডেপুটি পুলিস সুপারিন্-টেন্ডেণ্ট গোলাম হায়দার। তিনিও এসে মহম্মদ নওয়াজকে সেই অবস্থাতেই দেখলেন। অদ্ভুত এই দৃশ্য! একজন খুন-হওয়া মৃত দেহের পাশে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে একজন জীবন্ত লোক কি করে এমন দীর্ঘ সময় নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকতে পারে তা ভাববার বিষয়। গোলাম হায়দার তন্ন তন্ন করে ঘরের প্রত্যেকটি জিনিস পরীক্ষা করতে লাগলেন। ভালোভাবে অনুসন্ধান ক'রে দেখা গেল যে, রিভলবার থেকে দু'বার গুলি ছোঁড়া হয়েছে। সামসেদ বাঈ যে দিকে শুয়েছিলেন, বিছানার সেই দিককার দেওয়ালে, মেঝে থেকে সওয়া ছ'ফুট উঁচুতে গুলির দাগ রয়েছে। ঘরের বিপরীত দিকে জানালার কাছে স্যুটকেশের পাশে একটা কার্তুজের খোল পাওয়া গেল। অপর গুলিটার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। বেলা সাড়ে আটটার সময় ফটোগ্রাফার জগন্নাথকে ডাকা হয় ঘটনার কয়েকখানি ছবি নেবার জন্যে। এবং স্বভাবতই

প্রথম ছবি যা নেওয়া হ'ল, তা হচ্ছে জুলিয়েটের পাশে অভিন্ন রোমিও, অর্থাৎ মহম্মদ নওয়াজের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত শ্রীমতী সামসেদ বাঈের করুণ চিত্র।

বেলা ন'টার সময় প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মহম্মদ সাফী উপস্থিত হন এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৬৪ ধারা অনুসারে জবানবন্দী গ্রহণ করেন। মহম্মদ নওয়াজ শয্যাত্যাগ করেন বেলা প্রায় দশটার সময়। কিন্তু তিনি কোন জবানবন্দী দেন না। তাঁর কাছে পঁচিশ হাজার টাকার নোট ও একটি দামী ব্রেস্‌লেট পাওয়া যায়। ঐ দিনই সামসেদ বাঈকে হত্যা করার অপরাধে মহম্মদ নওয়াজকে গ্রেপ্তার ক'রে জেল হাজতে চালান দেওয়া হয়। অবশ্য হাজতে তাঁর যথারীতি সৌজন্য রক্ষা করা হয় এবং এই ঘটনার তিন সপ্তাহ পরে জাঙ্গের দায়রা জজ কর্তৃক তাঁর জামীন মঞ্জুর হয়। কিন্তু জামীনের বিরুদ্ধে হত্যাপরাধের অপরাধী হিসাবে সরকার পক্ষ থেকে জামীন নাকচের আবেদন করা হয় হাইকোর্টে। বিচার বিবেচনার পর হাইকোর্ট জামীন বাতিল ক'রে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তবে মহম্মদ নওয়াজের শারীরিক অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ থাকায় তাঁকে হাসপাতালে থাকবার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে পরে হাসপাতাল থেকে তাঁকে আর জেলে ফিরে আসতে হয়নি—বিধাতার অনুগ্রহে তিনি চিরতরেই সেখান থেকে মুক্তি পান। এই ব্যাপারে যদিও ১৯৪২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী মহম্মদ নওয়াজকে দায়রা সোপর্দ করা হয়, কিন্তু সামসেদ বাঈকে হত্যা করার অভিযোগে তাঁকে প্রথম গ্রেপ্তার করা হয় ১৯৪১ সালের ৯ই নভেম্বর। স্থানীয় জনসাধারণের উপর তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি থাকায় পাছে অর্থের সাহায্যে সাক্ষী বা বিচার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপর তিনি প্রভাব বিস্তার

করেন, এই আশঙ্কায় লাহোরের দায়রা আদালতে তাঁর বিচারের নির্দেশ দেওয়া হয়।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের দায়রা জজ মিঃ ডি. ফল্‌স-এর এজলাসে লাহোরে একদিন সাড়ম্বরে এই উত্তেজনাপূর্ণ মামলার বিচারের কাজ শুরু হয়। মহামান্য জজ সাহেবকে সহায়তা করার জন্যে চারজন বিশেষ সভ্য নিয়ে একটি সভাসদ-মণ্ডল তৈরী করা হয় এই মামলার জন্য।

সরকার পক্ষ সমর্থন করেন পাব্‌লিক প্রসিকিউটার মিঃ সিদ্দিকী এবং তাঁর সহকারী হন জাঙ্গের স্থানীয় বারের কয়েকজন সভ্য। আসামী পক্ষ সমর্থন করেন, ফৌজদারী আইনে বিশেষ অভিজ্ঞ, বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঞা আবদুল আজিজ এবং তাঁর সহকারী হন জাঙ্গ ও ও লাহোর বারের কয়েকজন জুনিয়ার মেম্বার। যেদিন এই বিচারের প্রথম শুনানি আরম্ভ হয়, সেদিন এই রহস্যজনক মামলা সম্পর্কে উৎসুক জনসাধারণ ও উৎসাহী আইনজীবী ও সাংবাদিকে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল বিচারালয়টি। আগেকার দিনে সাধারণতঃ বড় ধরণের রাজ-নৈতিক মামলায় যেমন হ'ত এটিও প্রায় সেই রকম হয়েছিল।

ফরিয়াদী পক্ষের প্রথম সাক্ষী ছিলেন জাঙ্গের সিভিল সার্জন্ ডাক্তার সের সিং। তিনি স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তারই পুনরুক্তি ক'রে বলেন যে, '৯ই নভেম্বর সামসেদ বাঙ্গয়ের শব-ব্যবচ্ছেদের ফলে তাঁর বাঁ দিককার ঘাড়ে সিকি ইঞ্চি ব্যাসের গুলির ক্ষত তিনি দেখতে পান; গুলিটি বাঁ দিক থেকে বিদ্ধ হয়ে ডান দিকে চলে গিয়েছিল। ডাক্তারের অভিমত এই যে, সামসেদ বাঙ্গকে যখন গুলি করা হয়, তখন সে মাথাটা বালিশের উপর রেখে ডান পাশ ফিরে শুয়েছিল। গুলিটা তিনি খুঁজে পান নি; তাঁর মতে গুলিটা

হয়ত ডান কানের ভেতর দিয়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো, কারণ সে কান দিয়ে রক্তস্রাব হতে দেখা গিয়েছিল। তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে, গুলিটা মাথার খুলির কোন অজ্ঞাত খাঁজে আটকে থাকাও বিচিত্র নয়। এই গুলি যা ডাঃ সের সিং পোস্ট-মর্টেমের সময়ও তল্লাস করতে পারেন নি, তা ৩০এ ডিসেম্বর লাহোরের মিঞা সাহেব কবরখানা থেকে যখন সামসেদের মৃতদেহ তোলা হয়, তখন সহকারী সিভিল সার্জন্ ডাঃ সৈয়দ মহম্মদ তাফেল সেই গুলির খোঁজ পান।

ডাঃ সের সিং আদালতকে একথা বুঝিয়ে দেন যে, আসামী রাত্রি দশটায় সুরাপান করলেও, রাত্রি আড়াইটার মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সেই কারণে তিনি মহম্মদ নওয়াজকে পরীক্ষার সময় তার মধ্যে অতিরিক্ত মদ্যপানের কোন বিশেষ লক্ষণ দেখেন নি।

ফরিয়াদী পক্ষের প্রধান সাক্ষী হিসাবে মহম্মদ হোসেনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হ'লে সে ২৩এ অক্টোবর চিকিৎসার জন্য আসামীর লাহোরে ফেলেটির হোটেলে অবস্থান, মুলতান গমন, খানেওয়ালে মত পরিবর্তন ও জাঙ্গে আগমন এবং সেদিনকার রাত্রের ঘটনার বিশদ বিবরণ প্রকাশ করে। জেরার উত্তরে মহম্মদ হোসেন বলে, 'নওয়াজ খান অত্যন্ত মদ্যপান করতেন। খানেওয়ালে সকাল আটটায় শুরু ক'রে রাত্রি দশটা পর্যন্ত তিনি ক্রমাগত মদ্যপান করেছিলেন। চার পাঁচটা খালি হুইস্কির বোতল বাথরুমে পাওয়া গিয়েছিল, এবং একটা পুরো বোতল শোবার ঘরে ছিল। সে একথাও স্বীকার করে যে, প্রথম মহম্মদ দু'তিন লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিক্রয় করায়, দ্বিতীয় মহম্মদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হয়েছিলেন।' ঘটনার দিন রাত্রে বৈঠকখানা ও শয়নকক্ষের দরজাটা বন্ধ ছিল, খিল দেওয়া যে ছিল না—এ কথাও সে স্বীকার করে। এই সময় এ কথাও

সে বলে যে, আসামী মহম্মদ নওয়াজের মাতা তাকে ৯ই নভেম্বর কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেন, কারণ ঘটনাটা কোনরকমে চাপা দেবার উপায় উদ্ভাবন করবার পূর্বেই সে পুলিসে খবর দিয়েছিল বলে।···

বাবুর্চি গামান এবং নেপালী চৌকিদার দাল সিংও একই সাক্ষ্য প্রদান করে। এই মামলায় খৈরান ও জোরা নামে আরও দু'জন বারাঙ্গনা সাক্ষী দিয়েছিল। তারা বলে, '৮ই নভেম্বর সন্ধ্যার দিকে তাদের গান করবার জন্য প্রাসাদে ডাকা হয়। সামসেদ বাঈকে ওদের সামনেই গান করার জন্যে মহম্মদ নওয়াজ অনুরোধ করেন, কিন্তু সে অস্বীকৃত হয় এবং তাতে নওয়াজ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন তার উপর।'···

অন্য উৎস থেকে এই ঘটনা সম্পর্কে আরও জানা যায় যে, সেদিনকার সেই সান্ধ্য-আসরে বৈঠকখানায় সাধারণ দু'জন বারাঙ্গনার উপস্থিতিতে সামসেদের মর্যাদায় আঘাত লাগে, সে নিজে যে শ্রেণীরই হোক, তবু তার একটা খানদানী আছে,—ওদের সামনে নিজেকে এমন ক'রে বিকিয়ে দিতে অপমানিত বোধ করে সামসেদ। সাময়িকভাবে নওয়াজের প্রতি তার বিতৃষ্ণা ও বিরক্তির ভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে। ওদের সম্মুখে সুরার পাত্রে সুরা ঢেলে দিতে সে অস্বীকৃত হয়; ঐ নিম্নস্তরের নাচগানওয়ালীদের মাতলামি ও অশ্লীল ব্যবহারের আতিশয্য তাকে অসহিষ্ণু করে তোলে এবং ওদের সম্মুখে নওয়াজের নানাপ্রকার অসংযত অনুরোধও সে প্রত্যাখ্যান করে। এই সময় একবার নওয়াজ জোর ক'রে তাকে তাঁর অঙ্কশায়িনী করবার জন্য চেপে ধরেন, কিন্তু সামসেদ তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়ে কবলমুক্ত হয়। স্থূলকায় নওয়াজ নিজেকে সামলাতে না পেরে উল্‌টে পড়েন। এই ব্যাপারে খৈরান ও

জোরা নেশার ঝোঁকে হো হো ক'রে হেসে ওঠে। এতে নওয়াজ আরো ক্রুদ্ধ হয়ে যান এবং তাদের গায়ে সুরাসমেত গ্লাস ছুঁড়ে মারেন। টল্‌তে টল্‌তে উঠে গিয়ে তাদের শারীরিক আবরণ খুলে ফেলার জন্য জিদ ধরেন। খৈরামের একটু বয়স হলেও, স্বাস্থ্যের অহংকার তার সর্বাঙ্গকে তখনও সজাগ করে রেখেছিল—অত্যন্ত সুগঠিত ও বলিষ্ঠ ছিল তার দেহ। নওয়াজ তাকে প্রায় অসংবৃতা ক'রে ফেললে লজ্জায় সঙ্কোচে সামসেদ প্রথমটা বালিশে নিজের মুখ ঢাকে ; তারপর উঠে গিয়ে উন্মত্ত নওয়াজকে নিরস্ত করার জন্য বাধা দেয়। সেই অবস্থায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে, নওয়াজ তাকে আক্রমণ করেন, কিন্তু সামসেদের কাছে মদমত্ত নওয়াজের অক্ষমতা সহজেই প্রমাণিত হয়—নিজেকে অনায়াসেই তাঁর কবলমুক্ত ক'রে নেয় ঐ তন্বী তরুণী। সমস্ত চুল তার খুলে যায়, ছিঁড়ে যায় মাথায় জড়ান মালার ফুল, পরনের বেনারসী,—বুকের বৃন্তে আঘাত লাগে।

সঙ্গীতের স্বরবিস্তার, নৃত্যের ছন্দ সমস্ত কিছুরই তাল কেটে যায় ক্ষণিকের মধ্যে। জোরা ও খৈরান তাদের প্রাপ্য নিয়ে সেই অবসরে বিদায় নেয়, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই বারবাড়ি থেকে নওয়াজকে নিয়ে সামসেদ আসেন ভেতর বাড়িতে শোবার ঘরে।

নিহত তরুণী সামসেদের ভাই তালিব হোসেন বলে যে, 'তার ভগ্নী রাত্রি আটটা ন'টার মধ্যে নওয়াজের শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে তার সঙ্গে আহার করে, তারপর আবার আসামীর কক্ষে ফিরে যায়।' সে আরো বলে যে, 'মহম্মদ নওয়াজ আমার ভগ্নীকে সতের বা আঠার শ' টাকা দেন এবং আমরা খুশি মনেই তাঁর (মহম্মদ নওয়াজ) অনুগমন করি। মহম্মদ নওয়াজের আচরণ সম্বন্ধে আমার ভগ্নী আমার কাছে কোন কিছুই অভিযোগ করে নি।'···

ফরিয়াদী পক্ষের এই সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্বন্ধে একমত কিনা এই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় মহম্মদ নওয়াজকে জেরা করা হয়। ফরিয়াদী পক্ষের তরফ থেকে তাঁকে জেরা করার সময় তিনি খুবই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং বলেন, 'একথা খুবই সত্যি যে, মহম্মদ হোসেন যখন আমায় জাগায় তখন আমি তাঁবুতে অঘোরে ঘুমিয়েছিলাম।—আমি সামসেদ বাঈকে হত্যা করিনি!'···

মিঞা আবদুল আজিজের জেরার উত্তরে সাক্ষী আরও বলে যে, 'আসামী লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিক্রী ক'রে সেই টাকা সুরাপান ও নানাবিধ কুৎসিত লাম্পট্যে খরচ করে। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং প্রাচীরপত্রের সাহায্যে আমি উচ্চাভিলাষী ক্রেতাদের সাবধান করে দিয়েছিলাম। আমি নিজেকে আসামীর প্রত্যাবর্তন-সূত্রে উত্তরাধিকারী মনে করি। সম্পত্তি এইভাবে নষ্ট করা, টাকার অপব্যয় করা, আমি বরদাস্ত করি না। আসামীর হয়ে আমি কোর্ট অফ ওয়ার্ডে দরখাস্ত করেছিলাম, এইভাবে সম্পত্তি উড়িয়ে দেওয়া বন্ধ করার জন্য। আমাদের উভয়ের মধ্যে এই কারণে কিছুদিন যাবৎ সদ্ভাব ছিল না।···

···'সংবাদ দেওয়া হ'লে পর লালা মনোহরলাল আমাদের সঙ্গে আসামীর বাড়িতে এসেছিলেন এবং প্রথম বিবৃতি গ্রহণের সময় মনোহরলাল উপস্থিত ছিলেন। আসামীর বিরুদ্ধে আমি যে দরখাস্ত করেছিলাম, সে সম্বন্ধে আমি লালা মনোহরলালের সঙ্গে আলোচনা করি।'···

আদালতে দ্বিতীয় মহম্মদ নওয়াজ আরো বলেন যে, 'খুন হয়েছে এ খবর শুনেও আমি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিনি, তার কারণ, আমার

ভয় হয়েছিল যে, আসামীর সঙ্গে আমার সদ্ভাব না থাকায় যদি আমাকে অহেতুক এই হত্যাকাণ্ডে জড়িয়ে ফেলা হয়।'···

ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষ্য গৃহীত হলে পর ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে প্রদত্ত আসামীর বিবৃতি আদালতে পাঠ করা হয়। তাতে আসামী ৮ই নভেম্বর বিকালে বর্ণিত সঙ্গীতের সময় তিনি যে সামসেদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এ কথা অস্বীকার করেন। উল্লিখিত রিভলবার যে তাঁর সে কথাও অবশ্য তিনি স্বীকার করেছিলেন। তিনি যে ৯ই নভেম্বর বেলা ন'টা পর্যন্ত সামসেদের সঙ্গে বিছানায় শুয়েছিলেন, তার কারণ লালা মনোহরলাল তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনি বিছানা ত্যাগ করলেই তাঁকে হত্যা করা হবে, তারপর তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে যান। বিবৃতি গ্রহণ করবার পর তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, 'এ সকল কথা সত্য কি না?'

উত্তরে তিনি বলেন, 'হাঁ এ সব সত্য।'

এর পর তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, 'আপনি কি আর কিছু বলতে ইচ্ছা করেন?'

—'হাঁ আমি একটি লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে ইচ্ছা করি।'

ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত সেই লিখিত বিবৃতিখানিও কোর্টে পাঠ করা হয়। সেই বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। সামসেদ বেগমকে আমি গুলি করিনি। সেরকম কোন অভিপ্রায়ই আমার ছিল না। আমি তাকে মোটা টাকা দিয়েছিলাম, এবং সেই সঙ্গে একটি মূল্যবান আংটিও। তার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবার ইচ্ছাতেই তাঁকে আমি সঙ্গে নিয়ে আসি। আমার বিরুদ্ধে যে সকল সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়া হয়েছে, সে সবই মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। আমার

প্রভূত সম্পত্তি হস্তগত করবার উদ্দেশ্যেই ঘটনার কয়েকদিন পরে ঐ সকল মিথ্যা সাক্ষ্য রচনা করা হয়।...

—'আমার স্ত্রী নেই এবং পুত্র সন্তানও নেই। আমি প্রভূত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক; তার কিছু আমি আমার বিমাতার কাছ থেকে পাই। আমার শত্রুপক্ষ আমার এই সকল সম্পত্তি কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের অধীনে আনবার চেষ্টা করছে।'...

দ্বিতীয় মহম্মদ নওয়াজের উপর স্পষ্টতঃ হত্যাকাণ্ডের কোন অভিযোগ না থাকলেও, ঐ লিখিত বিবৃতিতে তার যথেষ্ট ইঙ্গিত ছিল।

তিনি আরো বলেন, 'মহম্মদ নওয়াজ আমার জ্ঞাতি এবং প্রত্যাবর্তন-সূত্রে সম্পত্তির ওয়ারিসন। প্রায় আড়াই বৎসর যাবৎ তার সঙ্গে আমার সদ্ভাব নেই। উপরে উপরে অন্তরঙ্গের মত ভাব দেখালেও, সে আমার সম্পত্তি বিক্রয় বরদাস্ত করত না।'...

সে রাত্রের এই নিদারুণ দুর্ঘটনা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, 'আমি সেদিন রাত্রি দশটা পর্যন্ত মদ্যপান করি। তার পর সামসেদ বেগমের সঙ্গে শয়ন করি। ঘরে কোন আলো জ্বালা ছিল না; চাকর বাকরেরা যে যার ঘুমিয়েছিল; শোবার ঘরের সংলগ্ন দরজাতেও খিল দেওয়া ছিল না এবং বাথরুমের দরজাও খোলা ছিল। রাত্রে আমার ক্লান্তি, পীড়া এবং মত্ততাবশতঃ আমি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হই। তারপর হঠাৎ গোলযোগে আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়। আমি মহম্মদ হোসেনকে ডাকি, একটা গুলির শব্দ শুনতে পাই। আমার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, আতঙ্কে আমি তৎক্ষণাৎ হতবুদ্ধি হয়ে যাই।'...

দায়রা জজের সামনে আসামী মহম্মদ নওয়াজ আর কোন বিবৃতি দেননি। আর কোন রকমের এজাহার তাঁর পক্ষে ক্ষতিকরই হতে

পারত। হয়ত তাঁকে এমনই বোঝানো হয়েছিল যে, হত্যার প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ যখন তাঁর বিরুদ্ধে নেই, এবং বৈঠকখানা বা বাথরুমের ভেতর দিয়ে কোন হত্যাকারীর আগমনের যখন সম্ভাবনা রয়েছে, তখন সন্দেহের অজুহাতে তিনি রেহাই পেতে পারেন। অবশ্য ফরিয়াদী পক্ষ আসামীর আচরণে হত্যার কোন অভিসন্ধি প্রমাণ করতে পারেনি। পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকাকে সতর শ' টাকা দেওয়ার ব্যাপারে বালিকা আসামীর অনুগ্রহলাভে খুশিই ছিল বলে মনে হয়। তাছাড়া এ থেকে একথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মহম্মদ নওয়াজ তাকে বিবাহ না করলেও, প্রচুর অর্থ যে দিতেন তাতে আর সন্দেহ নেই।

শেষ পর্যন্ত সমস্ত শুনানি শেষ হ'লে, এই মামলায় বিশেষ যে চার জন এ্যাসেসর নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই এ বিষয়ে একমত হন যে, যেহেতু ফরিয়াদী পক্ষ আসামীকে সন্দেহাতীতভাবে দোষী সাব্যস্ত করতে পারেনি, সেহেতু মহম্মদ নওয়াজ খানকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ভাগ্যচক্রে দায়রা জজ এ বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, ফরিয়াদী আসামীর অপরাধ সাব্যস্ত করতে পেরেছে, এবং আসামী ভিন্ন অপর কেউই সামসেদ বাঈকে হত্যা করতে পারে না। অতএব এক্ষেত্রে এমন কোন কারণ নেই যার ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০০ ধারায় বর্ণিত হত্যাপরাধে অপরাধী করা না যায়।

এই মামলায় বিচারপতি চারটি বিশেষ সম্ভাবনা অর্থাৎ যা ঘটা সম্ভব, সেই বিষয় সম্পর্কে বিশদভাবে যা উল্লেখ করেন তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে :

১। আসামী ইচ্ছা করেই সামসেদ বাঈকে গুলি করেছিল।

২। কোন অপর ব্যক্তি বাইরে থেকে শয়নকক্ষে প্রবেশ ক'রে

হয় আসামীকে লক্ষ্য করে কিম্বা ঐ বালিকাকে লক্ষ্য করে গুলি করে থাকবে।

৩। মৃত বালিকা আত্মহত্যা করে থাকবে, অথবা—

৪। আসামী দৈবাৎ উক্ত সামসেদ বাঈ নামক বালিকা নর্তকীকে গুলি করে থাকবে।

তিন ও চার নম্বর অনুমান বাতিল করা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় বিচারপতি বলেন যে, 'মৃতার আত্মহত্যা করার কোন অভিসন্ধি থাকা সম্ভব নয়, কারণ সাক্ষ্য প্রমাণ অনুসারে বালিকা সতর শ' টাকা আসামীর কাছ থেকে পেয়েছিল, তাছাড়া আসামীর কাছে তখনও পঁচিশ হাজার টাকা ছিল, এবং তার মেজাজও ছিল খুব দিলদরিয়া,—সুতরাং এ অবস্থায় কোন বালিকাই আত্মহত্যা করতে পারে না। সে যদি আত্মহত্যা করত, তা'হলে রিভলবারটা হয় তার হাতে অথবা তার বিছানায় থাকত এবং ক্ষতস্থানে ঝলসানো বা বারুদের কাল দাগও দেখতে পাওয়া যেত।...

—'অকস্মাৎ ভুলক্রমে তাকে হত্যা করার অনুমানও সুদূরকল্পিত সম্ভাবনা। আসামী মহম্মদ নওয়াজ যদি নেশার ঝোঁকে মত্ত অবস্থায় তার রিভলবার নিয়ে খেলা করতে গিয়ে ইচ্ছে করেই গুলি ছুঁড়ত, তা'হলে সে পরক্ষণেই তা প্রকাশ করত। তাছাড়া দু'টি গুলি ছোঁড়া হয়েছিল, অতএব এ অনুমান গ্রহণযোগ্যই হতে পারে না। কারণ, একটাই গুলি দৈবাৎ বেরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু দু'টি গুলি ত' আর দৈবাৎ বেরোয় না!—বিশেষ ক'রে যে-রিভলবারের ঘোড়া টানতে রীতিমত জোর লাগত।'...

এই দুই অনুমান বাতিল করার পর, আদালতে অন্য দু'টি

অনুমান সম্পর্কে, . শেষ পর্যন্ত এই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, আসামী মহম্মদ নওয়াজ ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তির পক্ষে বালিকাকে গুলি করা সম্ভব কিনা। ফরিয়াদী পক্ষ বিশ্বাস করেন যে, আসামীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করবার একটি মাত্র দরজা ছিল বাথরুমের ভিতর দিয়ে। চাকরেরা যখন তার ডাক শুনে সেদিকে আসছিল, তখনও একটি গুলির শব্দ শোনা যায়। সুতরাং অপর কোন লোক যদি শয়নকক্ষ ত্যাগ করে বাথরুমের ভিতর দিয়ে পালাত, তা'হলে চাকরেরা তাকে নিশ্চয়ই দেখতে পেত। অবশ্য এই সাক্ষীরা আসামী পক্ষের সুবিধার জন্য তাদের পূর্ব-বিবৃতি থেকে বিচ্যুত হয়েছে এমন প্রমাণ থাকলেও,—কেউই কোন লোককে বাথরুমের ভিতর দিয়ে পালিয়ে যেতে দেখেছে, এমন কথা বলেনি। এখন কোন সাক্ষীর মুখ দিয়ে এ কথা বেরুলেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। বাড়ি থেকে কেউ বেরিয়ে পালাচ্ছে দেখতে পেলে, তারা নিশ্চয়ই একটা সোরগোল তুল্‌ত এবং এই ঘটনা সম্পর্কে আর কোন রহস্যই থাকত না।

শয়নকক্ষে প্রবেশ করবার অন্য কোন দিকে কোন পথ ছিল কিনা সে বিষয়ে আদালত বিশেষ অনুসন্ধান করবার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে,—আর কোন পথ ছিল না; কারণ বৈঠকখানা আর শোবারঘরে যাবার দরজাগুলো সবই যে ভিতর দিক থেকে বন্ধ ছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। দ্বিতীয় মহম্মদ নওয়াজ বা অপর কোন ভাড়াটে হত্যাকারীর দ্বারা এই ঘটনা অনুষ্ঠিত হতে পারত কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, সে সম্ভাবনা দ্বিতীয় নওয়াজের উপরই এসে পড়ে, কারণ আসামী জাঙ্গে এসেছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে। আদালত সিদ্ধান্ত করেন যে, ভৃত্যদের যোগাযোগ ভিন্ন দ্বিতীয় নওয়াজের

দ্বারা এ হত্যাকাণ্ড সম্ভব নয়, সুতরাং আদালত সেকথা প্রসঙ্গতঃ বিশ্বাস করবার কোন কারণ দেখতে পান না।

মৃতদেহের পার্শ্বে আসামীর এইরূপ দীর্ঘ সময় শুয়ে থাকা সম্পর্কে আদালত চিন্তা করেন যে, নিহিত রমণীর পাশে অপরাধীর আট ন'ঘণ্টা শায়িত থাকাকে কেবলমাত্র এক অদ্ভুত ব্যাপার বললে, সত্যিকার কিছুই বলা হয় না। আসামীর ভৃত্য মহম্মদ হোসেনের সাক্ষ্য অনুসারে—লালা মনোহরলাল আসবার পরও আসামী কেবল 'সে (সামসেদ) মারা গেছে!' ছাড়া আর যে কোন কথা বলে নি,—এ কথা না বিশ্বাস করবারও কোন কারণ নেই।

খৈরান ও জোরা নাম্নী দুই বারাঙ্গনার সাক্ষ্যে সামসেদ গান গাইতে অস্বীকার করায় আসামীর যে ক্রোধের উল্লেখ করা হয়েছে, তার উপর গুরুত্ব স্থাপনের কোন কারণ নেই ব'লে আদালত মনে করেন।

আসামীর উদ্দেশ্য অনুমান বা নির্ধারণ করবার কোনই আবশ্যকতা নেই। এক্ষেত্রে কেবল ঘটনাটা যা ঘটেছে সঙ্গতভাবে তারই অনুমান করা যেতে পারে। প্রথমতঃ একথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, রাত্রে আসামীর মত্ততা চরম সীমায় পৌছেছিল, এবং রাত বারোটা থেকে একটার মধ্যে যে কোন কারণেই হোক আসামী অত্যন্ত চঞ্চল ও বিপর্যস্ত হয়ে উঠে তার ভৃত্যদের চীৎকার করে ডাক দেয়, এবং সেই সময়েই কোন কারণে রিভলবার তুলে সামসেদকে গুলি করে—কি করছে না জেনেই। কোন লোকের মত্ত অবস্থা যখন সে স্বেচ্ছায় আনয়ন করে, তখন সেটা দোষ স্খালনের অজুহাত হয় না। এই অবস্থায় ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ড-বিধির ৩০২ ধারা অনুসারে হত্যাপরাধে আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যায়।

সামসেদ বাঈ হত্যা

প্রাণদণ্ডের আদেশের পরিবর্তে আসামী মহম্মদ নওয়াজের প্রতি যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ডের আদেশ দেওয়া হয় এবং আসামীর সামাজিক মর্যাদা এবং উন্নত প্রণালীর জীবনযাত্রার দরুণ সেই সঙ্গে তাঁকে প্রথম শ্রেণীর বন্দী হিসাবে গ্রহণ করবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

সামসেদ বাঈ হত্যা অপরাধে অভিযোগ সাব্যস্ত হওয়ার পর মহম্মদ নওয়াজ খানকে অবশ্য জেলে যেতে হয় নি। সেই সময় কিছুদিন তিনি মেয়ো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন এই মামলার রায় দেওয়া হয়। কয়েকদিন পরেই অবশ্য হাইকোর্টে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়। কিন্তু ৭ই জুলাই অন্যত্র তাঁর বিচারের ডাক পড়ে—মহম্মদ নওয়াজ খান মানুষের আইনের কবল এড়িয়ে লোকান্তর গমন করেন। প্রধান বিচারপতি স্যার ডগলাস ইয়ঙ্গ কাশ্মীর থেকে ফিরে আপিল শোনবার পূর্ব রাত্রেই মেয়ো হাসপাতালে মহম্মদ নওয়াজ দেহত্যাগ করেন।

এ ক্ষেত্রে হাইকোর্ট থেকে মহম্মদ নওয়াজ সন্দেহের অজুহাতে খালাস পেতেন, না দায়রা জজের রায়ই বহাল থাকত, তাও আমরা খানিকটা অনুমান করতে পারি। যথা—আসামীর হত্যার উদ্দেশ্য ছিল না এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও, সেটা ধর্তব্যের বিষয়ই নয়—দায়রা জজের এ মন্তব্যই ঠিক। তাছাড়া ইচ্ছাকৃত না হলে দুটো গুলি ছোঁড়া মোটেই সম্ভব নয়। চাকরদের ডাকবার পর একটি গুলি ছোঁড়া হয়, সে কথা অস্বীকার করা হয়েছে। হত্যাকারীকে পালাতে দেখে থাকলে গুলিটা ঘরের ভিতর ছোঁড়া হ'ত না। এ বিষয়ে মিঃ ফলস-এর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

মনোহরলালকে ফরিয়াদীর সাক্ষী-তালিকাভুক্ত করা হলেও, আদালতে তাঁর সাক্ষী গ্রহণ করা হয়নি—বিরোধী হিসাবে। আসামী নওয়াজও তাঁকে কাজে লাগাতে পারতেন, কিন্তু তিনিও তা পারেন নি। মৃতদেহের পাশে আসামীর আট ন'ঘণ্টা শুয়ে থাকার রহস্য হয়ত মনোহরলালই কিঞ্চিৎ উদ্ঘাটন করতে পারতেন, কারণ তিনিই প্রথম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন,—কি ভাবে ব্যাপারটা বোঝানো যাবে সেই উপদেশ দেবার জন্য। কোন হত্যাকারী মহম্মদ নওয়াজ এবং সামসেদ বাঈকে হত্যার অভিপ্রায়ে এসেছিল, এইভাবে ঘটনাটি সাজাবার জন্য নওয়াজকে চুপ-চাপ শুয়ে থাকার উপদেশ দেওয়া হয়—এরূপ কল্পনা করা খুব অসঙ্গত নয়। ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে এজাহার দাখিলের পর ব্যাপারটি ভিন্নরূপ প্রতীয়মান হওয়ায়, মহম্মদ নওয়াজ সংজ্ঞাহীন হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে-ছিলেন, কিন্তু তাতে যে তিনি নির্দোষ তা প্রমাণের পক্ষে কোন সহায়তাই করেনি। তাঁর জ্ঞাতি দ্বিতীয় মহম্মদ নওয়াজের উপর আনীত অভিযোগের ইঙ্গিতও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

মোটের উপর শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা যা দাঁড়াল তাতে ৮ই নভেম্বর দাব (Dab) পরিবারের প্রাসাদে যখন পঞ্চদশী সামসেদকে হত্যা করা হয় তখন বাস্তবিক কি পরিস্থিতি ঘটেছিল, কি অবস্থার মধ্যে উক্ত তরুণী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল, তার প্রকৃত রহস্য কখনই জানা সম্ভব হবে না, কারণ সে বালিকাও আজ নেই এবং আসামী হিসাবে যাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল তিনিও আজ পরপারে। সর্বশেষ তাদের দু'জনকে এক সঙ্গে জীবিত অবস্থায় যে দেখেছিল, সে হচ্ছে ভৃত্য গামান। সে সেইরাত্রে প্রভুর পদসেবা করছিল, যখন নওয়াজ সামসেদ বাঈয়ের সঙ্গে একই শয্যায় শুয়েছিলেন। দায়রা জজ অনুমান করেন

যে, মধ্যরাত্রে তাঁদের দু'জনের মধ্যে কিছু হয়ে থাকবে যা মহম্মদ নওয়াজ ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে বিবৃতি দেবার সময় হয় ভুলে গিয়েছিলেন, কিম্বা এমন কিছু হয়েছিল যা তিনি প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন নি। তবে তিনি যে ভুলে গিয়েছিলেন এ-কথা বিশ্বাস করা মোটেই সমীচীন নয়।

মহম্মদ নওয়াজের মৃত্যুর পর তাঁর সম্বন্ধে নানা জনের মুখে নানা কথা প্রকাশ হতে থাকে। তাঁর এক বিশ্বস্ত বন্ধুর কাছ থেকে আরো কিছু গোপন তথ্য প্রকাশিত হয়। মহম্মদ নওয়াজ নিজেই উক্ত বন্ধুকে নাকি বলেছিলেন, 'সামসেদের মত সুন্দরী সত্যিই কোনদিন আমার চোখে পড়েনি—শুধু সুন্দরী কেন, নিখুঁত সর্বাঙ্গসুন্দরী বললেও তার সম্বন্ধে অত্যুক্তি করা হয় না। উদ্বেলিত যৌবনের দীপ্তিতে যে কোন পুরুষের মনে সে উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারত। যেমন ছিল তার রূপ, তেমনি ছিল স্বাস্থ্য। নৃত্যের প্রতিটি লাস্যে, হাস্যের প্রতি ভঙ্গিমায়, নয়নের বিসৃষ্ট কারুকার্যে, নিতম্বের সঞ্চলন বিহারে আমাকে সে মুগ্ধ করে ফেলেছিল। কয়েকদিনের আলাপে আমি শুধু তার প্রেমেই পড়িনি, তাকে জীবনভোর শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে পাবারও নিদারুণ লালসা জেগেছিল আমার মনে—আমি তাকে বিবাহ করতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু কি যে হ'ল একদিন!'··· এইখানে বলতে বলতে তিনি নাকি অশ্রুসংবরণ করতে পারেন নি, কেঁদে ফেলেছিলেন। তারপর তিনি আরো যা বলেন, তা হচ্ছে সেই শেষ দিনের কথা। তিনি বলেন, দেশের বাড়িতে এসে প্রথম দিন রাত্রেই তাঁরা দু'জনে যখন বিছানায় শুয়েছেন, তখন সামসেদ নাকি তাঁকে নানাভাবে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে—উপহাস করে। চুরচুরে নেশায় চোখ

তাঁর তখন বুজে এসেছিল। সামসেদ তাঁর মধ্যে কামোন্মাদনা জাগাবার চেষ্টা করলেও শারীরিক দুর্বলতাবশতঃ তিনি তা এড়িয়ে চলতেই চেয়েছিলেন—সক্ষম হননি। এই অবস্থায় উক্ত মদালসা তরুণী তাঁকে উপভোগ করবার জন্য নানাভাবে পরিহাস করতে থাকে। মদান্ধ অবস্থায়, নেশার ঝোঁকে তিনি প্রথমটা চটে যান, তাঁর মর্যাদায় ভীষণ আঘাত লাগে। সামসেদকে তিনি ধাক্কা দেন। কোপনা যুবতী সামসেদও তাঁকে ধাক্কা দেয়, এবং তিনি বিছানা থেকে পড়ে যান। তারপরই মাথায় তাঁর খুন চেপে যায়; কয়েকঘণ্টা পূর্বে চিরজীবনের সঙ্গিনী হিসাবে যে তাঁর অঙ্কশায়িনী ছিল, তাকেই তিনি বালিশের তলা থেকে রিভলবার বার ক'রে গুলি করেন। এই কথা বলা শেষ হলে, নওয়াজ নাকি পাগলের মত হা হা ক'রে হেসে ওঠেন এবং বলেন, সামসেদ আর তাঁকে বিদ্রূপ করতে পারবে না!

সত্যিই যাঁরা সামসেদ বাঈকে দেখেছেন, তাঁরা একথা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, সামসেদ বাঈ অসামান্যা সুন্দরী ও সদাহাস্যময়ী তরুণী ছিলেন। কাঁচা সোনার মত ছিল তাঁর গায়ের রঙ, আর ফুটন্ত গোলাপের মত ছিল তাঁর যৌবন। সে গোলাপ আজ অসময়েই ঝরে গেল—সে হাসি আর কোন দিনই দেখা যাবে না, এবং তার গর্বিত যৌবন নিয়ে এই থলথলে মোটা, ভগ্নস্বাস্থ্য, বিগত-যৌবন ধনীর নবাব সন্তানকে বিদ্রূপ করতে আর সে ফিরে আসবে না!

আপীল কোর্টের অন্যতম বিচারক মাননীয় জাষ্টিস্ লর্ট উই-লিয়াম্‌সের ভাষায় 'প্লেগ জীবাণুঘটিত মামলা' বা 'পাকুড় ষড়যন্ত্রের মামলা'কে অপরাধের ইতিহাসে সম্ভবতঃ অদ্বিতীয় বলা যায়। মামলাটি আইন-সংক্রান্ত, ভেষজ-বিধান ও মনস্তত্ত্ববিষয়ক সমস্যায় পরিপূর্ণ। বিজ্ঞান-বুদ্ধির পৈশাচিক প্রয়োগ-সংঘটিত বীভৎস ভ্রাতৃহত্যামূলক মামলা ভারতবর্ষের ফৌজদারী মামলার সুদীর্ঘ ইতিহাসে এমন আর একটিও হয়নি।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত পাকুড়ের পাণ্ডে বংশের সন্তান বিনয়েন্দ্র নাথ পাণ্ডের বিরুদ্ধে, তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অমরেন্দ্রকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছিল। এই অভিযোগে বলা হয়েছিল যে, প্লেগজীবাণু ইন্‌জেক্‌সনের দ্বারা তিনি অমরেন্দ্রকে হত্যা এবং হত্যার ব্যাপারে সহায়তা করেন। এই ষড়যন্ত্র ও হত্যাভিনয়ের মধ্যে আরও কয়েকজন বিশেষ অভিনেতা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে (১) কলিকাতার জনৈক ব্যাকটিরিওলজিষ্ট ডাক্তার তারানাথ ভট্টাচার্য, (২) কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক এবং স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য এম. ডি., এবং (৩) ডাক্তার দুর্গারতন ধর। অপর একজন বিশেষ অভিনেতা, কৃষ্ণবর্ণ খদ্দরধারী ব'লে

যাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি হাওড়া ষ্টেশনে অমরেন্দ্রের ডান বাহুতে ছুঁচ ফুটিয়ে দিয়েছিলেন এবং যার ফলে শেষ পর্যন্ত অমরেন্দ্রের মৃত্যু ঘটে—তাঁর কোন খোঁজই পাওয়া যায়নি। মিষ্টার জাষ্টিস্ লর্ট উইলিয়াম্‌সের মতে এই লোকটিকেই প্রধানতঃ এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের সত্যিকারের অনুষ্ঠাতা ব'লে ধরা উচিত।

উপরে উল্লিখিত সকল আসামীকেই অমরেন্দ্রকে হত্যার ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। বিনয়েন্দ্রের বিরুদ্ধে হত্যার অনুষ্ঠানে সহায়তা করারও অভিযোগ ছিল। ডাক্তার ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ ছিল যে, মৃত্যুর সমর্থন-পত্র দিয়ে অমরেন্দ্রের শব-সংকারে সাহায্য ক'রে হত্যার প্রমাণ লোপাট হ'তে দেওয়া, এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ২০১ এবং ২০২ ধারা অনুসারে অপরাধের বিষয় কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত না করা। আলীপুরের দায়রা আদালতের বিচারে বিনয়েন্দ্র পাণ্ডে এবং ডাক্তার তারানাথ ভট্টাচার্যের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয় এবং ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য ও ডাক্তার দুর্গারতন ধর মুক্তিলাভ করেন।

বিনয়েন্দ্র ও অমরেন্দ্র পাকুড় রাজবংশের দুই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তাঁরা দু'জনেই একযোগে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। সেই সময় বিনয়েন্দ্রের বয়স সাতাশ বৎসর এবং অমরেন্দ্রের বয়স ষোল বৎসর। তাঁরা দু'জনেই আবার তাঁদের পিসীমা রাণী সূর্যবতীর সম্পত্তিরও ভাবী উত্তরাধিকারী ছিলেন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বিনয়েন্দ্রের পিতার মৃত্যুর পর পরিবারের কর্তা হিসাবে বিনয়েন্দ্রই সম্পত্তি দেখাশুনা করতেন। সেই সময় তাঁর চাল-চলনে নানা উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিলাসিতা দেখা দেয়, এবং তিনি রীতিমত বহু কদভ্যাসে জড়িত হয়ে পড়েন। ফলে, দুই ভাই মিলিতভাবে যে নগদ

টাকা উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছিলেন, তা তিনি একাই উড়িয়ে দেন। অমরেন্দ্র ও তাঁর আত্মীয়স্বজন এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার বিরোধিতা করেন। এই সময়, বিশেষ ক'রে বালিকাবালা নাম্নী এক নর্তকীর সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্ক সামাজিক দিক থেকে তাদের পরিবারের পক্ষে কলঙ্কের ও গ্লানিকর বোধ হয়। অমরেন্দ্র তখন পাটনায় বি. এ. ক্লাসের ছাত্র, সেখানে তাঁর থাকা এবং উপযুক্তভাবে অধ্যয়নের জন্য দারুন অর্থকষ্ট ভোগ করতে হ'ত। বার বার অর্থের জন্য বিনয়েন্দ্রকে তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যেত না। অন্যান্য কারণের সঙ্গে বিশেষ ক'রে এই কারণেও অমরেন্দ্র তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। একরকম এই সূত্র ধরেই দু'জনের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়, এবং দুই ভাইয়ের বিরোধ উত্তরোত্তর বেড়েই চলে।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে অমরেন্দ্র সাবালকত্ব লাভ করেন। এই সাবালকত্ব লাভ করার কিছুদিন পরেই বিনয়েন্দ্রের বিরুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের যৌথ-সম্পত্তির উপর তাঁর ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগ করতে আরম্ভ করেন।

১৯৩২ সালের ১২ই মে, অমরেন্দ্র অপর কয়েকজনের উপর ক্ষমতা দিয়ে এক এটর্নির চিঠি দাখিল করেন। এই সংবাদে বিনয়েন্দ্র অত্যন্ত উত্তেজিত হন এবং এই ঘটনার কিছুদিন পরে বিনয়েন্দ্রের ভীতি-প্রদর্শনে ভীত হয়ে এবং প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে, অমরেন্দ্র সেই ক্ষমতা-পত্র বাতিল ক'রে দিতে বাধ্য হন। এই সকল ঘটনার মধ্যে উক্ত সময় দুই ভায়ের মধ্যে যে-সকল পত্র-বিনিময় হয়েছিল, তা থেকেই তাঁদের ভিতরকার ক্রমবর্ধমান বিরোধের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। মনোমালিন্য

এবং এই ধূমায়িত বিরোধ ক্রমশঃ এমনি অবস্থায় এসে উপস্থিত হয় যে, শেষ পর্যন্ত সম্পত্তি বিভাগের আলোচনা প্রকাশ্যেই হতে আরম্ভ করে। সম্ভবতঃ এই সময়েই বিনয়েন্দ্র তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সাহায্যে অমরেন্দ্রকে চিরতরে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে অমরেন্দ্র ছিলেন দেওঘরে তাঁর পিসীমা রাণী সূর্যবতীর কাছে। এই সময় অক্টোবরের মাঝামাঝি একদিন বিনয়েন্দ্র সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন, একজন কম্পাউণ্ডার সঙ্গে ক'রে। সে অমরেন্দ্রকে নিয়ে বিকালে সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়ে, একস্থানে তাঁর নাকের উপর একটি ডাঁটি-হীন স্প্রিংয়ের চশমা চেপে ধরে। অমরেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বেশ খানিকটা যন্ত্রণা অনুভব করেন বটে, কিন্তু এ-ব্যাপারের তাৎপর্য বিশেষ কিছুই অনুভব করতে পারেন না। সেই রাত্রেই বিনয়েন্দ্র দেওঘর ত্যাগ ক'রে চলে যান এবং তার দু'তিন দিন পরেই অমরেন্দ্র অসুস্থ বোধ করেন। ডাক্তার সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর রোগ পরীক্ষা ক'রে অসুখটা টিটেনাস্ জীবাণু-সংঘটিত ব'লে মনে করায়, এ্যাণ্টিটিটেনাস সিরাম ইন্‌জেক্‌সন দেন। এই সময় তাঁদের গৃহ-চিকিৎসককে সঙ্গে ক'রে আনবার জন্য পাকুড়ে বিনয়েন্দ্রকে টেলিগ্রাম করা হয়। তাঁদের গৃহ-চিকিৎসকের পরিবর্তে বিনয়েন্দ্র ডাক্তার তারানাথ ভট্টাচার্য নামক এক ব্যক্তিকে কলকাতা থেকে নিয়ে আসেন এবং ডাক্তার সৌরীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন তারানাথকে তাঁর সহকারী হিসাবে রাখার জন্য। কিন্তু উক্ত ডাক্তার যখন দেখেন যে, ডাক্তার তারানাথ অমরেন্দ্রকে সিরাম চিকিৎসা ছেড়ে মরফিয়া ইন্‌জেক্‌সন করবার জন্য ব্যস্ত, তখন তিনি তাঁর পরামর্শ নিতে রাজী হন না। এই ব্যাপারে তাঁদের দু'জনকেই দেওঘর ত্যাগ করতে হয়। এই ঘটনার দশ দিন পরে বিনয়েন্দ্র আবার

দেওঘরে এসে হাজির হন ডাক্তার ডি. আর. ধরকে সঙ্গে ক'রে। তিনি ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অমরেন্দ্রকে কলকাতা থেকে আনা সিরাম ইন্‌জেক্‌সন দিতে প্ররোচিত করেন। পরে বাদীপক্ষের বিবৃতি অনুযায়ী জানা যায় যে, তাতে টিটেনাস্ টক্‌সিন ছিল। এই ইন্‌জেক্‌সনের পরে অমরেন্দ্রের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়ে। ডাক্তার ধরকে নিয়ে বিনয়েন্দ্র পরদিন সকালে দেওঘর ত্যাগ করেন। এক সপ্তাহ পরে আবার বিনয়েন্দ্র দেওঘরে উপস্থিত হন ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য ও ডাক্তার ধরকে সঙ্গে নিয়ে। ডাক্তার ভট্টাচার্য পুনরায় অমরেন্দ্রকে পরীক্ষা ক'রে আর একটা ওষুধের ব্যবস্থা দেন, কিন্তু অমরেন্দ্রের আত্মীয়রা তখন রীতিমত সন্দিগ্ধ-চিত্ত হয়ে পড়েছিলেন, কাজেই সে-ওষুধ ব্যবহার করতে তাঁরা রাজী হন না। ডাক্তার ধরের ওষুধে অমরেন্দ্রের দেহের যেখানে ইন্‌জেক্‌সন করা হয়েছিল, সেইখানে একটা ফোঁড়া দেখা দেয় এবং কলকাতার এল্. এম. ব্যানার্জী নামে অপর একজন ডাক্তার তাঁর উপর অস্ত্রোপচার করেন। প্রায় মাস ছ'য়েক তাঁকে ভুগতে হয় এই নিয়ে এবং দু'বার অস্ত্রোপচারের পর তিনি আরোগ্যলাভ করেন।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্কে এজমালি নামে গচ্ছিত ১৩,০০০৲ টাকা তুলে নেবার চেষ্টা করতে আরম্ভ করেন বিনয়েন্দ্র। এবং এ কাজ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে। এই সময় তিনি তাঁর নিজের এবং অমরেন্দ্রের উত্তরাধিকারের স্বীকার-পত্র (Succession certificate) পান। তাতে তাঁদের দু'জনকে মিলিতভাবে অথবা পৃথকভাবে ঋণ আদায় করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

গচ্ছিত টাকা তোলবার কথা জানতে পেরে অমরেন্দ্র তাঁর স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে আরও কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বদ্ধপরিকর হন। বিনয়েন্দ্রকে সেই টাকার হিসাব দাখিল করবার জন্যে, এবং হয় আপোষে নয়তো আদালতের সাহায্যে সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিষ্পত্তি করবার জন্যে তিনি উকিলদের পরামর্শ নিতে আরম্ভ করেন।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পাকুড় কোর্টে তাঁদের এজমালির পক্ষে একটা আপোষ মীমাংসার দরুন ১৭,০০০৲ টাকা জমা পড়ে এবং বিনয়েন্দ্র উক্ত টাকা তুলে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এই অভিসন্ধি জানতে পেরে অমরেন্দ্র এক আপত্তি-পত্র দাখিল করেন, ফলে বিনয়েন্দ্রের টাকা তোলবার প্রার্থনা না-মঞ্জুর হয়, তিনি আর টাকা তুলতে পারেন না। অমরেন্দ্রের মৃত্যুর কিছুদিন পর পর্যন্ত টাকাটা সেই ব্যাঙ্কেই পড়ে থাকে।

ক্রমশঃ দুই ভাইয়ের মধ্যে এই বিদ্বেষভাব চরমে এসে দাঁড়ায়। পরিবারের সকলেই বিশেষ ক'রে অমরেন্দ্র রীতিমত শঙ্কিত হয়ে ওঠেন বিনয়েন্দ্রর জন্য, এবং তিনি যে তাঁর ক্ষতিসাধনে মোটেই কুণ্ঠিত নন, এ সন্দেহও উত্তরোত্তর তাঁর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন দুই পক্ষীয় আত্মীয়রা প্রকাশ্যেই সম্পত্তি বিভাগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।

এই সময়কার একটি ঘটনা থেকে বিনয়েন্দ্রর দুরভিসন্ধি স্পষ্ট ধরা পড়ে। কলকাতায় থাকাকালীন অমরেন্দ্র তাঁর আত্মীয়, জ্যোতির্ময়ী ও অন্যান্য পরিজনদের সঙ্গে পূর্ণ থিয়েটারে যান। সেখানে তাঁরা একটি কালো বেঁটে খদ্দর-পরা লোকের সঙ্গে বিনয়েন্দ্রকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন। এই বেঁটে কালো লোকটি যে সেই একই লোক যে পরে অমরেন্দ্রের হাতে ছুঁচ ফুটিয়ে তাড়াতাড়ি তার মৃত্যু ঘটিয়েছিল,

সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই লোকটি অদ্যাবধি ফেরার হয়ে আছে—তার কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি।

এই চেষ্টায় ব্যর্থ হবার পর বিনয়েন্দ্র একেবারে মরিয়া হয়ে ওঠেন চূড়ান্ত পৈশাচিক উপায় অবলম্বন করবার জন্য। তাঁদের পিসীমা, রাণী সূর্যবতী অমরেন্দ্রকে নিয়ে ২৬এ নভেম্বর কলকাতা থেকে পাকুড় যাবার ঠিক করেন। বিনয়েন্দ্র এ কথা জানতে পেরে ষ্টেশনে এসে তাঁদের বিদায় দেবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।

উক্ত দিন রাণী সূর্যবতী অমরেন্দ্র এবং তাঁর ভগ্নী বনবালা ও তাঁর স্বর্গতা ভগিনীর কন্যা অণিমাকে সঙ্গে ক'রে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হন যথাসময়ে। তাঁরা বিনয়েন্দ্রকে ষ্টেশনের ফটকে অপেক্ষা করতে দেখেন। বুকিং-অফিস পার হয়ে প্লাটফর্মের দিকে অগ্রসর হবার সময় অমরেন্দ্র ছিলেন সবার আগে এবং বিনয়েন্দ্র ছিলেন দলের সবার শেষে। প্লাটফর্মের মধ্যে ঢুকেই অমরেন্দ্রের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আগত একটি লোকের ধাক্কা লাগে। এই লোকটিকেই অমরেন্দ্র পরে কালো খদ্দর-পরা ভদ্রলোক ব'লে বর্ণনা করেছিলেন।

ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গেই অমরেন্দ্র তাঁর ডান বাহুতে ছুঁচ ফোটার মত যন্ত্রণা অনুভব ক'রে চীৎকার ক'রে ওঠেন: 'কে যেন আমায় কি ফুটিয়ে দিলে!' এই সময় পেছন দিক থেকে এগিয়ে এসে বিনয়েন্দ্র তাঁর ক্ষতস্থানটা ঘষে দিয়ে ব্যাপারটা হাল্কা ক'রে দেবার জন্যে বলেন: 'ও কিছু নয়।' কিন্তু অমরেন্দ্র তাঁর হাতের আস্তিন গুটিয়ে ছুঁচ্ ফোটানোর মত একটা চিহ্ন তাঁর আত্মীয়দের দেখান, এবং তাঁরা সকলেই এটাকে কোন দুরভিসন্ধিমূলক দুষ্টপ্রকৃতি লোকের কর্ম বলেই সন্দেহ করেন। সেদিন ষ্টেশনে বিনয়েন্দ্রর এই উপস্থিতিতে সকলেই বিস্মিত হয়েছিলেন,

কারণ অমরেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর অসদ্ভাব থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের সৌজন্য-প্রকাশ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। ঘটনাটা অনেকের কাছেই অস্বাভাবিক ঠেকেছিল। তাঁর সঙ্গের আত্মীয়স্বজনরা এই ঘটনায় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন এবং পাকুড় যাওয়ার ব্যবস্থা স্থগিত রেখে তখনই রক্ত-পরীক্ষার জন্য কলকাতার বাড়িতে ফিরে যেতে মনস্থ করেন। কিন্তু সেই সময় বিনয়েন্দ্র তিলকে তাল করা হচ্ছে ব'লে তাঁদের ভৎর্সনা করেন এবং সেই ট্রেনেই যাবার জন্য জোর করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর কথা মতই কাজ হয়; অমরেন্দ্র ও তাঁর আত্মীয়স্বজন সেই ট্রেনেই পাকুড় যাত্রা করেন।

পাকুড়ে পৌছবার পর আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে অমরেন্দ্র আবার কলকাতায় ফিরে আসেন ২৯এ তারিখে। ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত তাঁকে পরীক্ষা করেন, এবং তাঁর হাতের ক্ষতচিহ্নকে ইন্‌জেক্‌সনের ছুঁচ ফোটানো বলেই মত প্রকাশ করেন। একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ডাক্তার সেনগুপ্ত প্রতিবাদী পক্ষের যুক্তি অস্বীকার করেন। প্রতিপক্ষ ক্ষতচিহ্নটি পোকা কামড়ানোর দাগ প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছিল। ডাক্তার সেনগুপ্ত কালবিলম্ব না ক'রে রক্ত-পরীক্ষা করবার উপদেশ দেন এবং ডাক্তার সন্তোষকুমার সেনগুপ্ত অমরেন্দ্রর রক্ত-পরীক্ষা করেন। ৪ঠা ডিসেম্বর অমরেন্দ্র মারা যান। ডাঃ শিবপদ ভট্টাচার্য অমরেন্দ্রর 'ডেথ্ সার্টিফিকেট' দেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেন যে, 'সেপটিক্ নিউমোনিয়ায়' রোগীর মৃত্যু ঘটেছে। এদিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রক্ত-পরীক্ষা ক'রে এবং শাদা ইঁদুরের উপর তা প্রয়োগ ক'রে ও অন্যান্য পরীক্ষার দ্বারা পাব্‌লিক হেলথ্ কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, অমরেন্দ্রর রক্ত বিউবনিক প্লেগ জীবাণু-দুষ্ট হয়েছিল।

প্লেগ-জীবাণুঘটিত হত্যাকাণ্ড

হাওড়া ষ্টেশনের ঘটনা সম্পর্কে অমরেন্দ্রর জ্যেষ্ঠা ভগিনী বনবালা দেবী নিম্ন আদালতের জেরার উত্তরে যা সাক্ষ্য দিয়েছেন তাতে সম্পূর্ণ কাহিনীটি ব্যক্ত হয়েছে। তাতে তিনি বলেছিলেন :

"রবিবারে আমরা হাওড়া ষ্টেশনে গিয়েছিলাম একটা ট্যাক্সি ক'রে। সেই ট্যাক্সিতে অমর, অণিমা, রাণী সূর্যবতী এবং আমি ছিলাম। ট্যাক্সি হাওড়া ষ্টেশনে পৌছলে সেখানে বিনয়ের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। অপর একখানা ট্যাক্সি আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছিল। সেই ট্যাক্সির মধ্যে 'দাদা' আর একজন কা'কে আমাদের ট্যাক্সি দেখিয়ে কি সঙ্কেত করছেন। লোকটা যে ঠিক কে তা আমি বুঝতে পারিনি। অমর গাড়ি থেকে নেবে ষ্টেশনের দিকে একবার এগিয়ে আবার ফিরে আসে। সে লোকটা তখন তার সঙ্গে যায়। 'বাবু' আগে আর বিনয় সবার পেছনে আর আমরা মেয়েরা মাঝে চলছিলাম। ফটকটা পার হয়েই অমর চেঁচিয়ে উঠলো, 'কে আমায় পিন ফুটিয়ে দিলে' ব'লে। দেখলাম, অমরের ডান হাতে ছুঁচ ফোটানোর মত দাগ। তার গায়ে ছিল একটা গেঞ্জি এবং তার উপর পাঞ্জাবি আর চাদর। পাঞ্জাবির হাতায় এক ফোঁটা তরল পদার্থের দাগও দেখতে পেলাম। প্লাটফর্মের কাছে কমলাপ্রসাদ আর অশোককেও আমরা দেখি। ট্রেনে ওঠবার পর অমর টিন্‌চার আইডিন চাইলে আমি তাকে তা বার ক'রে দিই। সে একটা ছুরি খুঁজছিল সেই জায়গাটা একটু চিরে দেবার জন্যে, কিন্তু ছুরি পাওয়া গেল না। অমর বললে, 'ট্রেন থেকে নেবে গেলেই ভাল হ'ত।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'অমর, তুমি লোকটাকে দেখতে পেয়েছিলে কি? লোকটা কি ভদ্র?' অমর বললে, 'লোকটা ভদ্রলোক নয়।' টিনচার আই-ডিন লাগাতে লাগাতে আমি এই সব কথা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।"

বিচারের সময় বিনয়েন্দ্র প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন প্রতিপক্ষের ভুল প্রমাণ করতে। নানাভাবে তিনি এই কথাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন যে, অমরেন্দ্র প্লেগে মারা গেছে এবং রোগ নির্ণয় করতেও ভুল হয়েছে। এই বিষয়ের সমর্থনের জন্য অনেকগুলি কারণ দেখিয়েছিলেন তিনি। যথাক্রমে সেগুলি হচ্ছে :

(১) রক্ত-পরীক্ষার সময় অপরের রক্তের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে।

(২) রক্তটা হয় দৈবাৎ বীজাণু-দুষ্ট হয়েছিল, অথবা ইচ্ছা করেই সেটাকে এমন করা হয়েছিল।

(৩) প্লেগ হ'লে সেটা তার বৈমাত্রেয় ভগিনী কাননবালা থেকেই সংক্রামিত হয়েছিল, কারণ গণ্ডস্ফীতি রোগে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর সে মারা গিয়েছিল ব'লে প্রকাশ।

(৪) অমর স্বাভাবিকভাবে হয় মশার কামড়ে, অথবা অন্য কোন ভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

কিন্তু তাঁর এই সকল যুক্তির কোনটাই সফল হয়নি কোন দিক থেকে এবং এই সম্পর্কে হাইকোর্টের বিচারপতি বলেন, "আমি পরম পরিতৃপ্ত যে, সরকারপক্ষ বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ না রেখেই প্রমাণ করতে সফলকাম হয়েছেন যে, অমরেন্দ্র প্লেগেই মারা যায়, এবং সেই প্লেগের জীবাণু হাওড়া ষ্টেশনে তার বাহুতে ইন্‌জেক্‌সন করা হয়েছিল কোন অজ্ঞাত লোকের দ্বারা, যে বর্তমানেও ফেরার হয়ে আছে।"

এইবার কি ভাবে মামলাটি আদালতে আসে এবং বিচারে কি পরিণতি লাভ করে যথাসম্ভব সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। অমরেন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রথম দিকে পাকুড় রাজ-বংশের আত্মীয়স্বজনরা ব্যাপারটা সম্বন্ধে

একটা পুলিস-তদন্তের আবেদন করবার আলোচনা করতে থাকেন। ঘটনাটা সেপ্টেম্বর মাসে ঘটলেও, সারা ডিসেম্বর ও জানুয়ারী এই আলোচনাই চলতে থাকে। ১৯৩৪ সালের ২২এ জানুয়ারী শেষ পর্যন্ত উক্ত পরিবারের জনৈক আত্মীয় কমলাপ্রসাদ পাণ্ডে নামক এক ব্যক্তি কলকাতার ডেপুটি পুলিস কমিশনারের কাছে এক আবেদন-পত্র দাখিল করেন।

তদন্তের পর ১৬ই ফেব্রুয়ারী বিনয়েন্দ্রকে বোম্বাই-গামী এক ট্রেনে গ্রেপ্তার করা হয়, আসানশোল ষ্টেশনে। এর দু'দিন পরেই, অর্থাৎ ১৮ই তারিখে গ্রেপ্তার করা হয় ডাক্তার তারানাথ ভট্টাচার্যকে। বোম্বাই এবং কলকাতায় একযোগে তদন্ত চালাবার পর এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বহু বিস্ময়কর তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে, যেদিন অমরেন্দ্র পূর্বকথিত কতকগুলি ক্ষমতা-পত্র দাখিল করেছিলেন, সেই দিনই তারানাথ বোম্বাইয়ের হফ্‌কিন ইনষ্টিটিউটের কর্তৃপক্ষের নিকট উত্তরের জন্য অগ্রিম মূল্য দিয়ে, জরুরী এক টেলিগ্রাম করেন। ভারতবর্ষে মাত্র ঐ জায়গাতেই প্লেগ-সম্পর্কীয় গবেষণা চালানো হয়। কর্তৃপক্ষকে পরীক্ষামূলক কাজের জন্য শক্তিশালী মারাত্মক রকমের প্লেগ-জীবাণু পাঠাবার অনুরোধ করা হয়। এই চিঠিটা লিখেছিলেন তারানাথ নিজেই, এবং ট্রপিক্যাল মেডিক্যাল স্কুলের ডিপ্লোমা ডি. টি. এম. যা তাঁর ছিল না, তাঁর নামের পূর্বে তিনি মিথ্যে ক'রে সেটিও বসিয়ে দিয়েছিলেন ঐ চিঠি লেখার সময়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, হফ্‌কিন ইনষ্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ তাঁকে সর্বপ্রথম বাংলার সার্জেন জেনারেলের অনুমতি-পত্র গ্রহণ করবার নির্দেশ দেন।

প্লেগ-জীবাণু সংগ্রহের প্রচেষ্টায় তারানাথ কলকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাক্তার উকীলের শরণাপন্ন হন। তাঁকে তারানাথ বলেন

যে, তিনি নিজে প্লেগের প্রতিষেধক ওষুধ আবিষ্কার করেছেন, অতএব তাঁর নিজের রসায়নাগারে, নিজের হেফাজতে সে-সম্বন্ধে ভালোভাবে পরীক্ষা চালাবার জন্য তিনি যেন এই জীবাণু-সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেন। ডাক্তার উকীল এ ব্যাপারে রাজীও হন, এবং হফ্‌কিন ইনষ্টিটিউটের ডাক্তার নাইডুর কাছ থেকে প্লেগের জীবাণুও পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তারানাথকে তাতে হাত দিতে দেওয়া হয় না। তাছাড়া যে পরিমাণ প্রাণশক্তিসম্পন্ন জীবাণু পাওয়া গিয়েছিল, তা ভালোভাবে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও, কয়েকদিনের মধ্যেই তার কার্যকরী-শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। এর পর তারানাথ আর একবার ডাক্তার উকীলকে এই জীবাণু আনয়নের জন্য পিড়াপীড়ি করেন, কিন্তু তিনি তাতে আর রাজী হননি।

অবশেষে একদিন তারানাথ ডাক্তার উকীলের কাছ থেকে হফ্‌কিন ইনষ্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে লেখা এক অনুরোধ-পত্র আদায় করেন। উক্ত অনুরোধ-পত্রে ডাক্তার উকীল তারানাথকে উক্ত ইনষ্টিটিউটে ব্যাকট্রিওলজিষ্ট হিসাবে তাঁর আবিষ্কৃত একটি ওষুধের রোগ-প্রতিষেধক শক্তি-সংক্রান্ত পরীক্ষামূলক গবেষণা চালাবার সুবিধা ক'রে দেবার জন্যই লিখেছিলেন।

এই অনুরোধ-পত্র প্রাপ্তির কয়েকদিন পরে ১৯৩৩ সালের ৩০এ এপ্রিল, বিনয়েন্দ্র নিজেই বোম্বাই গিয়ে উপস্থিত হন এবং 'ওরিয়েণ্ট হোটেলে' গিয়ে ওঠেন। যথাক্রমে হোটেলের খাতা থেকে তাঁর নাম ঠিকানা ও সময় পাওয়া যায়। বিনয়েন্দ্র তারানাথের ঐ চিঠিটি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান এবং বোম্বাইয়ে পৌঁছে পরের দিনই হফ্‌কিন ইনষ্টিটিউটের ডাক্তার নাইডুর সঙ্গে দেখা ক'রে ডাক্তার উকীলের চিঠিটি তাঁকে দেখিয়ে

বলেন যে, তিনি তারানাথের বন্ধু, তাঁর জন্যেই জানতে এসেছেন যে, তিনি তাঁকে তাঁর গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দিতে পারবেন কিনা? বিনয়েন্দ্রর সমস্ত কথা শুনে ডাক্তার নাইডু বলেন, তাঁর বন্ধুকে সর্বপ্রথম হফ্‌কিন ইনষ্টিটিউটের ডাইরেকটারকে লিখে তাঁর অনুমতি নিতে হবে, তা না হ'লে তিনি সাহায্য করতে পারবেন না। সেযাত্রা ডাক্তার নাইডুর কথায় হতাশ হয়ে বিনয়েন্দ্র কলকাতায় ফিরে আসেন। কিন্তু ১লা জুলাই বিনয়েন্দ্র আবার বোম্বাই যান এবং এবার গিয়ে ওঠেন 'সী ভিউ' হোটেলে। সেখানে পৌঁছে নানাভাবে অর্থের সাহায্যে প্লেগ-জীবাণু সংগ্রহের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা আরম্ভ করেন। এই সময় হফ্‌কিন ইনষ্টিটিউটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দু'জন ভেটারনারী সার্জেন, ডাক্তার নগরজন এবং ডাক্তার সাদীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়, কিন্তু তাঁদের সাহায্যেও এই ষড়যন্ত্র-কার্য সিদ্ধ হয় না, তাঁরাও অকৃতকার্য হন শেষ পর্যন্ত। তবে এই সময়ে একটা প্রয়োজনীয় সংবাদ তিনি সংগ্রহ করেন যে, আর্থার রোডের সংক্রামক রোগের হাসপাতালে চেষ্টা করলে তিনি প্লেগ-জীবাণু পেতে পারেন। সেই সূত্রে বিনয়েন্দ্র হাসপাতালের সুপারিনটেনডেণ্ট ডাক্তার প্যাটেলের সঙ্গে দেখা ক'রে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি তাঁর ডাক্তার বন্ধুটিকে তাঁর গবেষণাগারে প্লেগের ওষুধ সম্বন্ধে পরীক্ষা করার অনুমতি দিতে পারেন কি না? শেষ পর্যন্ত ডাক্তার প্যাটেল বিনয়েন্দ্রর অনুরোধ রক্ষা করেন, এবং তাঁর সহকারী ডাক্তার সাদীকে ব'লে দেন যে, একজন বাঙালী ডাক্তার আসবেন প্লেগের ওষুধ সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য, অতএব তিনি যেন তাঁকে তাঁর কাজ চালাবার সুযোগ-সুবিধা ক'রে দেন।

বিনয়েন্দ্রর অনুরোধ-ক্রমে ডাক্তার সাদী, ডাক্তার তারানাথ এলে

তাঁর কাজের জন্য হফ্‌কিন ইন্‌ষ্টিটিউট থেকে এক টিউব্ সজীব প্লেগ-জীবাণু আনবার অনুমতি নিয়ে রাখেন ডাক্তার প্যাটেলের কাছ থেকে। ৭ই জুলাই তারানাথ বোম্বাই-এ এসে উপস্থিত হন এবং বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে সেই হোটেলেই গিয়ে ওঠেন। পরীক্ষার জন্য দু'জনে গিয়ে বাজার থেকে কতকগুলো ইঁদুর কেনেন তাঁরা। ডাক্তার প্যাটেল তারানাথকে ডাক্তার সাদীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি ইতোমধ্যেই কতকগুলি জীবাণুর কৃষ্টি-সাধন (culture) করেছিলেন; তারানাথ সেগুলি ইঁদুরের উপর প্রয়োগ করলে একটি ছাড়া ইঁদুরগুলি সবই মারা যায়।

তারানাথকে কয়েকদিন গবেষণাগারে স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ দেওয়া হয়, এবং তিনি তাঁর প্রয়োজন মত উক্ত গবেষণাগারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করতে পান। এই সুযোগের পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার করেন তারানাথ; এইবার তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় জীবাণু-সংগ্রহে কৃতকার্য হন। ১২ই জুলাই সন্ধ্যায়, তখনও একটি ইঁদুরের উপর তাঁর পরীক্ষার কাজ বাকী, তারানাথ ডাক্তার সাদীর কাছে এসে প্রস্তাব করেন যে, তাঁকে একটি জরুরী কাজে এখুনি কলকাতায় রওনা হ'তে হবে এবং কয়েকদিন পরে তিনি আবার ফিরে আসবেন। কিন্তু তিনি আর সে-মুখো হননি এবং পরে ডাক্তার সাদী বা ডাক্তার প্যাটেলের সঙ্গে কোনদিন কোন পত্রালাপও করেন নি। সেই রাত্রেই বিনয়েন্দ্র ও তারানাথ দু'জনেই বোম্বাই থেকে কলকাতা অভিমুখে রওনা হন।

এই হত্যাকাণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট আর একটি যোগসূত্রের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বোম্বাইয়ে থাকাকালীন বিনয়েন্দ্র বম্বে মিউচুয়াল লাইফ য়্যাসিয়োরেন্স কোম্পানীতে অমরেন্দ্রর নামে একটি ৫১,০০০৲

হাজার টাকার জীবনবীমা ক'রে দেবার আয়োজন করেন। তাতে তিনি কোম্পানীর উপর এই সর্ত আরোপের চেষ্টা করেন যে, মৃত্যুর পর অমরেন্দ্রর সে-পলিসি নিয়ে কোন বিরোধ বা আপত্তি উত্থাপন করা চলবে না। কিন্তু এই অস্বাভাবিক সর্ত কোম্পানী গ্রাহ্য করতে অস্বীকার করায়, শেষ পর্যন্ত সে বীমা গৃহীত হয় না।

এই ফৌজদারী মকদ্দমায় নিজেদের দোষ ক্ষালনের জন্য বিনয়েন্দ্র ও তারানাথ উভয়ে নিজেদের পক্ষে যে সকল যুক্তির অবতারণা করেছিলেন, এক্ষেত্রে সেগুলির উল্লেখ করা অবান্তর হবে না। বোম্বাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে তারানাথের বক্তব্য ছিল এই যে, তিনি একটা প্লেগের ওষুধ আবিষ্কার করতে পেরেছেন ব'লে বিশ্বাস করতেন, এবং তারই কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। সেই সময় বিনয়েন্দ্রকে কোন কাজে বোম্বাই যেতে হয় ব'লে, তিনি তাঁকে হফ্‌কিন ইনষ্টিটিউটে এই অনুসন্ধানের ভার দেন। অমরেন্দ্রকে হত্যা করার কোন স্বার্থই তাঁর ছিল না এবং তিনি যে বিনয়েন্দ্রের কাছ থেকে ঐ কাজের জন্য কোন টাকা পেয়েছিলেন তারও কোন প্রমাণ নেই।

বিনয়েন্দ্রর বক্তব্য এই ছিল যে, তিনি ফিল্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে বোম্বাই গিয়েছিলেন এবং ফিল্ম শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বন্ধু হিসাবে, তারানাথের কোন দরকার সেখানে আছে কিনা তা নিজেই তিনি খোঁজ করেন। পাকুড়স্থ তাঁর শত্রুপক্ষীয়দের ষড়যন্ত্রের ফলেই তাঁকে এইভাবে জড়িত করা হয়েছে ব'লে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

মাননীয় বিচারপতি মিষ্টার লর্ট উইলিয়ামস্ তাঁর রায়ে যা বলেছিলেন তা হচ্ছে, "তারানাথের যে কোনদিন প্লেগের কোন ওষুধ মাথায় ছিল বা সে আবিষ্কার করেছিল, অথবা সে-বিষয়ে পরীক্ষা করার ইচ্ছা ছিল,

অথবা প্লেগের জীবাণু-সংগ্রহ করার কাজ ছাড়া বিনয়েন্দ্রর বোম্বাইযাত্রার অপর কোন্ উদ্দেশ্য ছিল, কিম্বা তারানাথের কাজের স্থবিধা করবার জন্যেই সে গিয়েছিল, এ সবের বিন্দুবিসর্গ প্রমাণ নেই।”…

হাইকোর্টে আপীলের আবেদন-পত্রে বিনয়েন্দ্রর তরফের উকিল মিঃ এন. কে. বস্থ নিম্নলিখিত আইনের ফাঁক উল্লেখ করেছিলেন :

(১) ভ্রমাত্মক সাক্ষ্যের প্রশ্রয় দেওয়া।

(২) দায়রা বিচারপতি কর্তৃক সেসন জুরীদের ভুল বোঝানো এবং না-বোঝানো।

(৩) ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোডের ৩৪২ ধারা অনুযায়ী দায়রা বিচারক আপীলকারীদের উপযুক্ত পরীক্ষা করতে অসমর্থ।

এই সকল বিষয়ে বিচারপতি মাননীয় লর্ট উইলিয়ামস্ মন্তব্য করেন যে, (১) “এস্থলে আপত্তি উত্থাপনের সামান্য অবকাশ থাকতে পারে, কারণ মৌখিক ও লিখিত এমন অনেক সাক্ষ্য প্রযুক্ত হয়েছিল, যেগুলির সঙ্গতি সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল এবং যেগুলি একেবারেই পরিত্যক্ত হলে স্থবিবেচনার কাজ হ’ত। সাক্ষ্যের অনুমতি সম্বন্ধে যুক্তি উত্থাপন করলে, কোর্টের আসামীর পক্ষেই স্থবিধা দিয়ে বাদীপক্ষের যাবতীয় সন্দেহজনক অথবা দূরাগত সঙ্গতিযুক্ত সাক্ষ্যগুলি বাতিল করা উচিত। এমন কতকগুলি সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুমোদন করা হয়েছিল, যেগুলি স্পষ্টতই অসঙ্গত এবং অনুমোদনের অযোগ্য। (২) জুরীদের না-বোঝানো বা ভুল বোঝানো সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, প্রথমতঃ দায়রা জজ জুরীদের মনে করিয়ে দেননি যে, আসামী বিশেষের সম্পর্কে প্রদত্ত বিবৃতিকে অপর আসামীর উপর আরোপ করা চলবে না যদি জুরীরা অপর আসামীকে দোষী সাব্যস্ত না করেন, তার বিপক্ষের বিবৃতি অনুযায়ী। দ্বিতীয়তঃ,

মামলাটি ফরিয়াদীর অনুকূলে জুরীদের বর্ণনা ক'রে এবং কেবল সেই পক্ষের যুক্তিগুলিই পরিষ্কার বুঝিয়ে, যে সকল অংশ সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর না করে, সাক্ষ্যের টীকার উপর নির্ভর করা হয়েছে,—সেগুলি স্পষ্ট-ভাবে উল্লেখ না ক'রে দায়রা বিচারক ভুল করেছিলেন। (৩) বিচারের শেষে সাধারণভাবে আসামীকে পরীক্ষা না করতে পারার যে অভিযোগ বিচারকের উপর আরোপ করা হয়েছে, এবং যে-সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি বার বার আকর্ষণ করা হয়েছিল, সে বিষয়ে সমালোচনা যুক্তিসঙ্গতই বলা চলে। ফৌজদারী মামলায় প্রমাণের দায়িত্ব আসামীর উপর পড়ে না, এবং তাদের নির্দোষিতা প্রমাণ করবার অথবা তার স্বপক্ষে সাক্ষ্য বা বিবৃতি-দেবার কোন বাধ্যবাধকতা তাদের নেই,—একথা মনে রাখলে বলতে হয় যে, বিজ্ঞ বিচারকের মন্তব্য জুরীদের ভুল পথে পরিচালনারই সামিল হয়েছিল।"···

শেষ পর্যন্ত বিচারপতি উইলিয়ামস্ আসামী পক্ষের য়্যাড্ভোকেট উত্থাপিত আপত্তি সম্পর্কের মন্তব্যে বলেন, "মোটের উপর যাই হোক আমি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছি যে, এই সকল ত্রুটি অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর—এ ছাড়া জটিল সাক্ষ্য প্রমাণসমূহের সুবিবেচিত বিশ্লেষণের উপরই অভিযোগ সাব্যস্ত হয়েছে।

"তা না হ'লেও যদি আমার মনে হ'ত যে, এই সকল ত্রুটি আসামী পক্ষের বিশেষ ক্ষতিকর হয়েছে অথবা এগুলি বাদ দিলে ভিন্ন ফল হ'ত, ঐ সকল বর্তমান থাকায় বিচারে বিঘ্ন ঘটেছে, তা'হলে আমি পুনর্বিচারের আদেশ দিতাম। উপস্থিত এই সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হয়েছি যে, এই সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ, যা সন্দেহজনক বা দূরাগত সঙ্গতিযুক্ত, একেবারে পরিত্যাগ করেই সেগুলিকে আমি আমোল দিইনি।"

বিচারপতি আরও বলেন যে, "বিশেষভাবে আলোচনা করার পর আমি ঠিক্ করেছি যে, সকল দিক থেকে বিবেচনা করলে একমাত্র এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এই দুই আপীলকারী মিলিতভাবে অমরেন্দ্রকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল, এবং এই উদ্দেশ্যে বর্তমানে ফেরার কোন এক ব্যক্তিকে প্লেগ-জীবাণু সরবরাহ করা হয়েছিল, (পূর্ব-উল্লিখিত উপায়ে বোম্বাই থেকে সংগ্রহ ক'রে) এবং সেই লোকই ওদের প্ররোচনায় অমরেন্দ্রকে হত্যা করেছিল হাওড়া ষ্টেশনে তার বাহুতে প্লেগ-জীবাণু ইন্‌জেক্‌সন ক'রে—যার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ অমরেন্দ্রর মৃত্যু হয়।

"চিকিৎসা বিশারদ এবং স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট থেকে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ না রেখে আমি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, বোম্বাই ভিন্ন এবং যে উপায় উল্লেখ করা হয়েছে সে-উপায় ব্যতীত কিছুতেই প্লেগ-জীবাণু সংগ্রহ করা সম্ভব হ'ত না।"

বিচারপতি সর্বশেষ এই মন্তব্য করেন যে, "এই হত্যাকাণ্ড প্রায় দু'বছর পূর্বে সংঘটিত হয়। আপীলকারীদের গ্রেপ্তার করা হয় ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে এবং বিচারের জন্য হাজির করা হয় মে মাসে, এবং তারা বিচারাধীন থাকে ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। আপীল ও তৎসংক্রান্ত নথিপত্র এই অফিসে গৃহীত হয় ২৫এ ফেব্রুয়ারী, কিন্তু ২রা জুলাই অর্থাৎ প্রায় চার মাস পরে কাগজপত্র তৈরী হয়। প্রাণদণ্ডের ব্যাপারে এত বিলম্ব হওয়ার কোন কারণ নেই, এবং এটা কৈফিয়ৎ-সাপেক্ষ। এই বিলম্ব এবং বিচার কাজের মাঝে দীর্ঘ অবকাশ আসায় আপীলকারীদের প্রায় দশ মাস প্রাণদণ্ডাদিষ্ট হয়ে বসে থাকতে হয়েছে।

"এই সকল দিকের কথা চিন্তা ক'রে এবং এই মামলার ঘটনা ও অবস্থার কথা বিবেচনা ক'রে,—যা কেবল আনুষঙ্গিক প্রমাণের উপর

নির্ভর করে, এবং এই উপায়ে আসল আসামী, যে এই পৈশাচিক অপরাধের অনুষ্ঠান করেছে, তাকে একদিন আবিষ্কার করা বা অনুমান করা সম্ভব হতে পারে এই আশায় আমরা প্রাণদণ্ড সাব্যস্ত করি না, বরং তার পরিবর্তে উভয় আবেদনকারীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দেওয়ারই পক্ষপাতি।" এই কথা বলে মাননীয় বিচারপতি বিচিত্র-ভ্রাতৃ-হত্যামূলক এই ফৌজদারী মামলার বিচারকার্যের যবনিকা টানেন।

রাত্রি তখন সাড়ে আটটা হবে, একটা ট্যাক্সি ছুটে চলেছে কলকাতার গরাণহাটার ভিতর দিয়ে। গাড়িখানা শিব-মন্দিরের কাছাকাছি আসতেই ভিতর থেকে একজন চিৎকার করে উঠলো, "এরা আমায় মেরে ফেলবে—আমায় মেরে ফেলতে নিয়ে যাচ্ছে!" সেপ্টেম্বর মাসের রাত, তার উপর এই কুখ্যাত পল্লী, পথে লোক চলাচল খুব কম। যে দু'একজন লোক তখনও পথে চলাফেরা করছিল, এই অস্বাভাবিক আর্তনাদে তারা ট্যাক্সিটাকে রুখে দাঁড়ালো। চার পাঁচ জনে গাড়িটাকে ঘিরে ভিতরকার যাত্রীদের প্রশ্ন করলে, "ব্যাপার কি?" যাত্রীদের মধ্যে একজন বুঝিয়ে দিলে যে, তারা একটু ফুর্তি করতে চলেছে, পানশালায়। যে লোকটা চেঁচিয়ে উঠলো তার মদের মাত্রা বেশী হয়ে গেছে, কাজেই গাড়ির মধ্যে মাত্‌লামো শুরু করেছে। "যত সব মাতালে কাণ্ড!" ব'লে, অবজ্ঞাসূচক ভঙ্গী ক'রে ট্যাক্সিকে পথ ছেড়ে দিয়ে যে-যার গন্তব্যস্থলে চলে গেল। ট্যাক্সিখানা ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ছুটলো কোথায় এবং ভেতরকার লোকগুলোই বা কারা, কেউই তার জন্যে আর কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করলো না।

পরদিন ১৯৩৬ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর, সকাল প্রায় আটটার সময় কর্পোরেশনের ওভারসিয়ার বাবু বিনয়কুমার রায় হন্তদন্ত হয়ে শ্যামপুকুর

পাগলা খুনের মামলা

থানায় এসে খবর দিলেন, তাঁর কুলি মোহন, একটা মুণ্ডুকাটা দেহ দেখতে পেয়েছে বলরাম মজুমদার ষ্ট্রীটের কাছে, একটা নর্দামা-গলিতে। খবর পেয়েই থানার কর্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ইন্‌স্‌পেক্টার মিঃ রায় আর তদন্তকারী অফিসার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষাল মহাশয়দ্বয় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ব্যাপারটা দেখেই শিউরে উঠলেন। সেই গলির ভিতরে একটা ছোট্ট খাটালে একটা মৃতদেহ চিৎ ক'রে শোয়ানো। খাটালটা নিচে থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে। মৃতদেহের ঘাড় থেকে মুণ্ডুটা চুপিয়ে কাটা। তলপেটে দুটো গভীর ক্ষতচিহ্ন; এমন কি দুই পায়ের মাংস-পেশীর খানিকটা অংশও কেটে ফেলা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের এই বীভৎস পাশবিকতা দেখে তাঁরা প্রথমটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন বটে, কিন্তু তাতে সময় নষ্ট না ক'রে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে আরম্ভ করলেন সঙ্গে সঙ্গে। ফলে, মৃতদেহের তলা থেকে একটা ছেঁড়া রক্তে-ভেজা গেঞ্জি ও পৈতে পাওয়া গেল। মৃতদেহের কিছু দূরে মেঝের উপর দু'জায়গায় চাপ চাপ আধ-জমা রক্তের দাগ। তা দেখে মনে হ'ল লোকটাকে মেঝের উপর হত্যা ক'রে তারপর দেহটা খাটালে তুলে রাখা হয়েছে।

হত্যাকাণ্ডটা দেখলেই বেশ বোঝা যায় যে, কাজটা একজন বা দু'জনের দ্বারা সম্ভব হয়নি, দু'জনের বেশী লোক লেগেছে এই ব্যাপারে। ঘটনাস্থলটি এতই নির্জন যে, স্থানীয় অধিবাসীরা ঘটনা সম্বন্ধে কেউ কিছুই বলতে পারলে না। একটি মাত্র কুকুর বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে মৃতদেহের কাছে বসেছিল। মনে হয়, সে-ই এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের একমাত্র সাক্ষী—হয়ত দেখে থাকবে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সবই, কিন্তু প্রকাশ করার ভাষা তার ছিল না। মোহন নামক কুলি বললে যে, কুকুরটা এই খাটালেরই

বাসিন্দা ; সুতরাং মৃত লোকটি তার প্রভু কিনা সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা থেকে তাঁরা ক্ষান্ত হলেন। ইন্‌সপেক্টার রায় নিবিষ্টভাবে পরীক্ষা ক'রে মৃতদেহের বাম বাহুতে একটা উল্কি-তোলা ফুলের দাগ দেখতে পেলেন, পরে অবশ্য সেটা অনেক সাহায্য করেছিল দেহটা কার সনাক্ত করবার কাজে। তখনকার মত কেবল জানা যায় যে, লোকটা হিন্দু এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ ; আর মেঝেতে আধ-জমা রক্তের দাগ থেকে অনুমান হ'ল, লোকটা পূর্ব-রাত্রি আটটা থেকে ন'টার মধ্যে খুন হওয়া সম্ভব। মৃত-দেহের আলোকচিত্র নেওয়ার পর, সেটা পুলিসের শব-ব্যবচ্ছেদাগারে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়।

এই হত্যাকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শহরে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়—লোকের মুখে মুখে আতঙ্কের ছায়া পড়ে। পুলিস অফিসারদের মধ্যেও ব্যস্ততা প্রকাশ পায়,—কি ক'রে এই হত্যাকাণ্ডের সূত্র আবিষ্কার করা যায় তাই নিয়ে। প্রথমতঃ জানা দরকার নিহত ব্যক্তির পরিচয়, দ্বিতীয়তঃ এই হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতে প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল। এই দুটি জিনিস জানলে তবেই হত্যাকারীদের প্রকৃত অনুসন্ধান করা সম্ভব। গোয়েন্দা বিভাগের সহায়তায় ইন্‌সপেক্টার মিঃ রায় এবং তদন্তকারী অফিসার মিঃ ঘোষাল প্রাণপণ চেষ্টায় কাজ শুরু করলেন বটে, কিন্তু প্রথম দিকে সেটা ঠিক অন্ধকারে হাত-পা ছোঁড়ার মতই হয়েছিল। একটা কিছু আনুমানিক সূত্র না পেলে কোনদিকেই এগুনো সম্ভব নয়। একজন অনুমান করলেন : নিহত লোকটা হয়ত স্থানীয় কোন গৃহের ভৃত্য ছিল, সেই পরিবারের কোন মহিলার সঙ্গে অবৈধ ঘনিষ্ঠতার ফলে তাকে হত্যা করা হয়ে থাকবে। এই অনুমানটা খুব যুক্তিসঙ্গত বলে মনে না হলেও, তখন সামনে এ ছাড়া

আর অন্য কোন সম্ভাব্য সঙ্কেত ছিল না। সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও, তাঁরা সেই পথেই অগ্রসর হবার সঙ্কল্প করেছিলেন। কিন্তু পরদিন রাত্রি আটটার সময় অম্বিকা নামক একটি লোকের কথায় তাঁরা যেন নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে আলোক-শিখা দেখতে পেলেন।

অম্বিকা বললে, "আমি অতুল ওরফে পাগলা বলে একজনকে জানি, গত পরশু (৪ঠা সেপ্টেম্বর) সোনাগাছির একটা বাড়ির রোয়াকে মণীন্দ্র বলে একজনের সঙ্গে তাকে বসে থাকতে দেখেছিলাম। তার চার ধারে তখন ঘিরে দাঁড়িয়েছিল কতকগুলি দুষ্ট প্রকৃতির লোক। তাদের মধ্যে একজন পাগলাকে বলে, 'আমিই সেই খোকা—তুই জানিস না? তোকে মেরে শেষ করব, নাক কেটে গন্ধর্খাদা করে দেব!' পাগলা ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয়, 'আমাকে মাফ্ কর, আমি আর তার কাছে যাব না।' মণীন্দ্র সেই লোকটাকে অনুনয় করে বলে, 'ওকে এ-যাত্রা ছেড়ে দাও।' তারা পাগলাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। তখন আমি পাগলার সঙ্গে গরাণহাটার দিকে যাই। সেখানে হঠাৎ একটা রোয়াক থেকে আবার খোকা ও আর একটা ফর্সা লোক পাগলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলা টিপে ধরে। তারপর খোকা সেই ফর্সা লোকটাকে একটা ট্যাক্সি আনতে বলে। সে যখন ট্যাক্সি আনতে যাচ্ছে, তখন আমি পালাবার চেষ্টা করতেই লোকটা আমায় বাধা দিয়ে বলে, 'তুই কোথা পালাচ্ছিস রে শালা?' আমি তার উত্তরে যেই বলি, 'মিথ্যে কেন আমাকে গালাগাল দিচ্ছ।' অমনি সে তেড়ে উঠে বলে, 'ফের যদি একটা কথা বলেছিস ত' মেরে ফেলবো।' খোকা বলে, 'ওকে এখন ছেড়ে দে, পরে দরকার হলে দেখা যাবে।' ওদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে আমি মণীন্দ্রকে এ-বিষয় জানিয়ে বাড়ি ফিরি। ফেরবার সময় হঠাৎ দেখি, একটি

ট্যাক্সির পিছনের আসনে পাগলা, সেই ফর্সা লোকটা, খোকা ও আরও চার পাঁচ জন কোথায় চলেছে।”...

এর পর ইন্‌সপেক্টার মিঃ রায় অল্প সময়ের মধ্যেই মণীন্দ্রকে খুঁজে বার করেন। সে অম্বিকার কথা সমর্থন করে। অধিকন্তু সে বলে যে, 'সে বহিষ্কৃত গুণ্ডা খোকাকেও জানে। ৩৫নং ইমামবক্স থানাদার লেনের এক বাড়িতে মলিনা নামে এক সুন্দরী চিত্রাভিনেত্রীর কাছে সে যায়।

অম্বিকা ও মণীন্দ্রের কথা থেকে তাঁরা অনুসন্ধানের সূত্র পান এবং প্রথমেই মলিনার সন্ধান বার করা সাব্যস্ত করেন। প্রথম দিন মলিনার বাড়ি যাওয়ার পথে আরো দু'এক জায়গায় তাঁরা খোঁজ-খবর নেন। স্থানীয় লোকেরা তখন খোকা ও তার দলবলের ভয়ে সন্ত্রস্ত; তাদের বিরুদ্ধে কেউই কিছু বলতে সাহস করে না। ইন্‌সপেক্টার মিঃ রায় তখন মিঃ ঘোষাল প্রভৃতি পুলিসের লোকদের দূরে অপেক্ষা করতে বলে, নিজে এক লম্পটের বেশে নীলমণি মিত্র লেনের নাকী-বীণা নামে এক বারাঙ্গনার বাড়িতে উপস্থিত হন। বীণার দুই চাকরকে আজেবাজে নানা প্রশ্ন করে মিঃ রায় জানতে পারেন যে, তারা পাগলাকে দশ বৎসর যাবৎ দেখছে, সে বারবনিতা মহলে খুবই পরিচিত। চাকর দুটো তাঁকে আরও বলে যে, গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে আটটার সময় হইচই শুনে তারা উপর থেকে নিচে নেবে এসে দেখে, আট ন'জন লোক তাদের বাড়ির ভিতর ঢুকে পাগলাকে ধরে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। পাগলা সম্ভবতঃ বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়েছিল আশ্রয় নেবার জন্যে। তারা পাগলাকে টেনে একটা ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে যায়। স্থানীয় লোকদের কেউই পাগলাকে উদ্ধার করবার জন্য এগিয়ে যেতে সাহস

করেনি। চাকর দুটো ট্যাক্সির লোকগুলোর বিষয় আর কিছু বলতে পারে না।

এদের বিবরণ শুনে মিঃ ঘোষাল বলেন, "অম্বিকা বাড়ি ফেরবার পথে যে ট্যাক্সিখানাতে পাগলাকে দেখেছিল, এটা সেই ট্যাক্সি। পাগলা হয়ত কোন প্রকারে একবার পালিয়ে নাকী-বীণার ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছিল।"

মিঃ রায় তাঁর অনুমান সমর্থন করে বলেন, "চলুন, এখন আর বিলম্ব না করে মলিনার থানাদার লেনের বাড়িতে হানা দেওয়া যাক।"

মলিনার বাড়িতে উপস্থিত হয়েই তাঁরা দেখেন, মলিনার মা সরোজিনী পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে উত্তরপাড়া যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে। তার কাছ থেকে জানা যায় যে, মলিনা খোকার সঙ্গে উত্তরপাড়ায় গেছে। মিঃ রায় তৎক্ষণাৎ মিঃ ঘোষালকে সরোজিনীর সঙ্গে ট্যাক্সিতে উত্তরপাড়া পাঠিয়ে, নিজে সেখানে অপেক্ষা করতে থাকেন অন্যান্য বিষয় অনুসন্ধান করার জন্য। মিঃ ঘোষাল উত্তরপাড়ায় গিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে কেবলমাত্র মলিনাকে দেখতে পান। মলিনা সেখান থেকে মিঃ ঘোষালকে সোনাগাছিতে ঊষা নাম্নী এক বারাঙ্গনার বাড়িতে নিয়ে আসে। মলিনা আর ঊষা একই রকম জবানবন্দী দেয়। তাদের জবানবন্দী অনুসারে ঊষার উপপতি ভূপেনকে মিঃ ঘোষাল গ্রেপ্তার করেন। সে সেইখানেই তখন উপস্থিত ছিল।

মলিনার জবানবন্দী থেকে জানা যায় যে, মলিনা বর্তমান আট ন'মাস যাবৎ খোকার রক্ষিতা। পাগলাকে সে আট ন'বছর ধরে জানে, পাগলা তার ঘরে আসত। দিন কয়েক পূর্বে খোকা মলিনাকে বলে যে, সে যেন পাগলাকে তার ঘরে ঢুকতে না দেয়। কারণ, পাগলা নাকি তাকে

এই ব'লে শাসিয়েছে যে, সে 'বহিষ্কৃত গুণ্ডা' আবার কলকাতায় ফিরে এসেছে, একথা পুলিসকে সে জানিয়ে দেবে। এই ঘটনার সপ্তাহখানেক পরেই পুলিস সত্যি সত্যিই একদিন মলিনার ঘরে এসে খোকার খোঁজ নেয়, কিন্তু খোকা আগে থেকেই এ বিষয় জানতে পেরে সেখানে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। ৩রা সেপ্টেম্বর রাত্রি ন'টার সময় খোকার এক বন্ধু কালী এসে মলিনাকে সোনাগাছিতে ঊষার বাড়িতে নিয়ে যায়, খোকা তার সঙ্গে দেখা করবে ব'লে। প্রায় রাত দশটার সময় খোকা সেখানে আসে। তখন তার সঙ্গে ছিল কেষ্ট নামে আর এক ডানপিটে গুণ্ডা। সে সময় খোকার গায়ে ছিল নীল রঙের একটা সার্ট। তাতে মলিনা রক্তের মত দাগ দেখেছিল। খোকা তাকে বলে যে, ওটা রক্ত নয়, পানের পীচ। সেখান থেকে খোকা, কেষ্ট আর কালীকে সঙ্গে নিয়ে চলে যায়। আবার রাত্রি দেড়টার সময় খোকা আর কেষ্ট সেখানে ফিরে আসে। তখন খোকার গায়ে ছিল ক্রীম রঙের সার্ট। সবে মাত্র স্নান করে সে এসেছিল এবং তার গা থেকে তীব্র সেন্টের গন্ধ বেরুচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে ভূপেনও সেখানে এসে উপস্থিত হয়। সেদিন তারা সকলেই ঊষার বাড়িতে রাত কাটিয়েছিল। তার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হতে পারে এই আশঙ্কায়, পরদিন সকালে খোকা কলকাতা ত্যাগ করবার মতলব করে। সেই উদ্দেশ্যে খোকা মলিনার মা সরোজিনীকে যতদূর সম্ভব শীঘ্র আসতে ব'লে, নিজে মলিনাকে নিয়ে উত্তরপাড়ায় চলে যায়।

পরবর্তী অনুসন্ধানে মিঃ রায় জানতে পারেন যে, গুণ্ডাদমন-বিভাগের দু'জন কনষ্টেবল খোকাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যই মলিনার বাড়ি গিয়েছিল। তারা এ সন্ধান পাগলার কাছ থেকে পায়নি, অপর কোন

লোকের কাছ থেকে পেয়ে থাকবে। এ বিষয় আরো জানতে পারা যায় যে, এক মহিলার অভিযোগক্রমে ছিঁচকে চুরির অপরাধে খোকার বন্ধু কেষ্টকে বটতলা থানার একজন কনষ্টেবল গ্রেপ্তার করেছিল, কিন্তু তার পরদিন কোর্ট থেকে তাকে জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই মহিলার সঙ্গে পাগলার কোন সম্পর্ক ছিল না।

এই সব শোনার পর মিঃ ঘোষাল বলেন, "দেখুন মিঃ রায়, আমার মনে হয়, মলিনার ঘরে খোকার অনুসন্ধানে পুলিসের হানা এবং কেষ্টর গ্রেপ্তার এই দুই ঘটনায় খোকার মনে হয়েছিল যে, এর মূলে হ'ল পাগলা, যেহেতু পাগলার শাসানির কয়েকদিন পরেই এই সব ঘটনা ঘটেছিল।"

মিঃ রায় তাঁকে সমর্থন করে বলেন, "এ থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব।"

এর পর মলিনাকে তার বাসায় পৌঁছে দিয়ে, সেখানে দু'জন কনষ্টেবল মোতায়েন করে মিঃ রায় সেদিনকার মত অনুসন্ধান-কার্য শেষ করেন।

পরদিন পূর্বোক্ত সব সাক্ষীদের পুলিস শব-ব্যবচ্ছেদাগারে নিয়ে গিয়ে হাজির করে শব সনাক্তের জন্য। তারা সকলেই মস্তকহীন সেই নগ্ন দেহকে পাগলার দেহ বলে সনাক্ত করে। কারণ, অত্যধিক মত্ত অবস্থায় পাগলাকে উলঙ্গ দেখবার তাদের সকলেরই প্রায় সুযোগ হয়েছিল।

মিঃ রায় অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছিলেন যে, পাগলার এক ভাই আছে। তিনি বনগাঁর একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক। তাঁকেও কলকাতায় আনা হয়েছিল। তিনিও শব দেখে সেটা যে তাঁর ভাইয়ের দেহ তা চিনতে পেরেছিলেন, যদিও তাঁর সঙ্গে অনেক বছর যাবৎ তাঁর এই ভাইয়ের কোন সম্পর্ক ছিল না।

এই সময় মিঃ ঘোষাল মিঃ রায়কে প্রশ্ন করেন, "অঙ্গের বিশেষ চিহ্ন দেখে এইভাবে মস্তকহীন দেহ সনাক্ত করাটা কি গ্রাহ্য হবে?"

উত্তরে মিঃ রায় বলেন যে, "সেটা জুরীদের উপরই ছেড়ে দেওয়া যাবে।...এটা ত' যা হোক এক রকম হ'ল। এখন এই মারাত্মক খোকাটি কে, সেইটিই বার করা যায় কেমন ক'রে, তাই বলুন? লোকে তাকে কেবল একজন বহিষ্কৃত গুণ্ডা বলেই জানে, তার বেশী ত' কিছুই আর তার সম্বন্ধে পাওয়া যাচ্ছে না?"

মিঃ ঘোষাল আবার প্রশ্ন করেন, "কেন, গুণ্ডা-বিভাগের দপ্তর থেকে কিছু পাওয়া যায়নি?"

উত্তরে মিঃ রায় বলেন, "না, সেখানে খেঁদা বলে এক বহিষ্কৃত গুণ্ডার সম্বন্ধে সামান্য নথিপত্র আছে মাত্র।"

সেই সময় মিঃ ঘোষাল কি যেন ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, হঠাৎ তিনি বলে ওঠেন, "দেখুন মিঃ রায়, প্রায় বছরখানেক আগে, আর এক দাগী আসামী শিউচরণের নির্দেশে খেঁদাকে ১০নং কৃপানাথ লেনে তার পৈতৃক বাড়িতে গ্রেপ্তার করতে গিছলাম, কিন্তু সে তখন পলাতক। তার পরদিনই শিউচরণ খুন হয়েছিল। আমার মনে হয়, খোকা আর খেঁদা একই লোক।"

মিঃ রায় বলেন, "আপনার অনুমান একেবারে অসম্ভব নয়।"

এর পর ১০নং কৃপানাথ লেনে গিয়ে মিঃ ঘোষাল ঘরের মেঝে খুঁড়িয়ে ফেলেন, যদি ছিন্ন-মুণ্ডুটা বেরিয়ে পড়ে এই আশায়। কিন্তু তার বদলে আশ্চর্যভাবে মাটির তলা থেকে পুঁতে-রাখা প্রচুর গহনাপত্র ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিস পাওয়া যায়। মিঃ ঘোষাল খুঁজে খুঁজে সেখান থেকে রক্তের দাগ-লাগা একটা ধুতি, আণ্ডারউয়্যার, দুটো পাঞ্জাবি

পান, সবগুলোতেই রক্তের দাগ লাগা। সেখান থেকে আরও কয়েকটা কাপড় উদ্ধার করেন তিনি; সেগুলো সবই খেঁদার, তাতে ইংরেজীতে 'এস' চিহ্ন লেখা ছিল।

এই অনুসন্ধানের মধ্যে মিঃ রায়ও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। বাড়িটা প্রায় বেশ্যালয়ের মতই। অনেক ভাড়াটে তাতে। মিঃ রায় ভাড়াটেদের জবানবন্দী নিতে আরম্ভ করেন। সেই বাড়ির তিনটি স্ত্রীলোক বলে যে, তারা রাত্রি সাড়ে বারোটার সময় খেঁদার বাবা আশু আর তার কাকা শশীকে ঘরের ভিতরে খেঁদার সঙ্গে ফিস ফিস করে কথা কইতে শুনেছিল। তারপর সকালে তারা একটা বালতিতে কাপড়-চোপড় ধুতেও দেখে-ছিল; বালতির জলটা লালচে হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা তৎক্ষণাৎ আশু ও শশীকে গ্রেপ্তার করেন। গোয়েন্দা বিভাগের সাব-ইন্‌সপেক্টার দত্ত এক ধোপার বাড়িতে গিয়ে রক্তের দাগ-লাগা 'এস' চিহ্ন দেওয়া কতক-গুলো কাপড় জামা উদ্ধার করেন। খেঁদার ঘর থেকে একটা নোটবই পাওয়া গেল, তাতে লেখা: ৫ই সেপ্টেম্বর, ধোপারবাড়ি কাপড়গুলো পাঠানো হ'ল। মিঃ রায়, দেবেন নামে আর একজন সাক্ষী আবিষ্কার করেন। দেবেন, ওই পাড়ারই বাসিন্দা। খেঁদাকে সে তার ছেলেবেলা থেকেই জানে। দেবেনের জবানবন্দীতে তাঁদের তদন্তের কাজ খুব সহজ হয়ে যায়।

দেবেন বলে, "১৯৩৬ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর, রাত সাড়ে বারটার সময় আমি খেঁদাদের বাড়ির রোয়াকে যখন বসেছিলাম, তখন দেখি কেষ্টর সঙ্গে খেঁদা আসছে, তার পা খালি, গায়ে নীল রঙের একটা সার্ট। তার সার্টে আর ধুতিতে রক্তের মত দাগ লাগা। হাতে একটা শাদা-বাঁটের ছোরা, ছোরার ফলাটা জামার আস্তিনের মধ্যে লুকানো। খেঁদাই

একলা তাদের বাড়িতে ঢুকলো। স্নান করে, পোষাক বদলে, ঘণ্টাখানেক পরে আবার বেরুল সে। গায়ে তখন তার একটা ক্রীম রঙের সার্ট। আমায় দেখে খেঁদা রিভলবারটা একবার বার ক'রে মুখ বন্ধ রাখতে ইঙ্গিত করলে, তারপর কেষ্টর সঙ্গে দ্রুত চলে গেল। কেষ্ট বাইরেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল তার জন্যে।"

যতদূর সূত্র পাওয়া গেল, তাই নিয়েই মিঃ রায় এবং মিঃ ঘোষাল তন্ময় হয়েছিলেন। মিঃ ঘোষাল বললেন, "দেখুন মিঃ রায়, অম্বিকা, মলিনা আর দেবেনের জবানবন্দী থেকে সময় মিলিয়ে দেখে আমার মনে একটা স্পষ্ট ধারণা হচ্ছে।"

—"কি মনে হচ্ছে আপনার?"

—"আমার মনে হয়, খেঁদা ওরফে খোকা রাত্রি আটটা অথবা সাড়ে আটটার সময় পাগলাকে পাকড়াও করে, এবং ন'টা নাগাদ সেই গলির খাটালে গিয়ে তাকে খুন করে। তারপর কাছাকাছি কোথাও পোষাক পালটে তারা ঊষার বাড়িতে গিয়ে মলিনার সঙ্গে দেখা করে এবং কিছুক্ষণ পরে আবার সেই খাটালে গিয়ে মৃতদেহ থেকে মুণ্ডুটা কেটে নিয়ে কোথাও ফেলে দিয়ে, কেবল খোকা আর কেষ্ট কৃপানাথ লেনে ফিরে আসে। মুণ্ডু কাটার ব্যাপারে খেঁদাই একা হয়ত হাত দিয়েছিল, তাই তারই পোষাক পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছিল। এই থেকে বোঝা যায়, সেই রাত্রে খেঁদা দু'বার স্নান করে পোষাক বদল করেছিল।"

মিঃ রায় প্রশ্ন করেন, "মলিনা যে বলেছে, খেঁদার গায়ের নীল সার্টে লাল দাগ সে লক্ষ্য করেছিল?—যেটাকে খেঁদা পানের পীচ

মিঃ ঘোষাল, "ওটাতে একটু ধোঁকা হতে পারে বটে, কিন্তু পোষাক

পরিবর্তন করার সময় অসাবধানতাবশতঃ অন্য কাপড় থেকে ওটাতে লেগে গিয়ে থাকতে পারে, অথবা সেটা পানের পীচও হতে পারে।"

মিঃ রায়, "আর এক কথা, রাত্রে নীলের উপর রক্তের দাগ না পানের পীচ বুঝবেন কেমন করে?"

মিঃ ঘোষাল, "দু'রকমে পরীক্ষা করলেই সন্দেহ ঘুচে যাবে।"

মিঃ রায়, "খেঁদার ঘর থেকে দু'দফা রক্তের দাগ লাগা পরিচ্ছদ পাওয়া গেছে—এতে আপনার কি ধারণা হয়?"

মিঃ ঘোষাল, "আমি মনে করছি, খুন করবার পর খেঁদা আর কেষ্ট খিড়কি দরজা দিয়ে সকলের অজ্ঞাতসারে তাদের বাড়িতে ঢুকে পোষাক বদলে গিয়ে থাকবে; নয়ত খেঁদা অন্য কাপড়ের উপর (যেগুলো ধোপার বাড়ি পাঠাবার জন্য প্রস্তুত ছিল) রক্তের দাগ-লাগা কাপড়চোপড় ফেলে থাকবে।"

মিঃ রায়, "কিন্তু দেবেনের জবানবন্দী থেকে আমরা এটা জানতে পেরেছি যে, খেঁদা রক্ত-লাগা পোষাক পরেই বাড়ি ঢুকেছে। যদি মৃতদেহ থেকেই মুণ্ডু বিচ্ছিন্ন করা হয়, তা'হলে কি অত রক্ত লাগতে পারে?"

এই প্রশ্নের উত্তর সঙ্গে সঙ্গে না দিয়ে মিঃ ঘোষাল দু'এক মিনিট নিরুত্তর থেকে টেলিফোনের ঘরে উঠে যান। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফিরে এসে বলেন, "মিঃ রায়, পুলিস সার্জেণ্টের শব-ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষায় জানা গেছে যে, যখন শব থেকে মুণ্ডুটা কাটা হয় তখন পর্যন্ত দেহে প্রাণ ছিল। কাজেই আমরা স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, রাত বারটার পর খেঁদা এই কাজটা সেরে বাড়ি ফিরেছিল।"

(পানের পীচ সম্বন্ধে পরীক্ষা করে সরকার পক্ষের কৌঁসিলী মিঃ এস.

এম. বোস পরে প্রমাণ করেছিলেন যে, নীলের উপর পানের পীচ রাত্রে লাল দেখায় এবং রক্তের দাগ দেখায় কালো।)

এই সিদ্ধান্তের পর তাঁরা একে একে আসামীদের সন্ধানে তৎপর হন। অম্বিকার বর্ণনা অনুসারে সেই ফর্সা চেহারার লোকটার হদিস মেলে—তার নাম গোপী, পুরাতন পাপী সে। খুঁজে খুঁজে মিঃ ঘোষাল গোপী সেন লেনের ডলি নাম্নী এক বারবনিতার ঘরে হানা দিয়ে জানতে পারেন যে, গোপী ডলিকে নিয়ে মালপত্র ফেলে হঠাৎ উধাও হয়েছে। সেই বাড়ির তিনকড়ি নামে আর একজন লোক বলে যে, "৫ই সেপ্টেম্বর সকালে সে ডলিকে তার ঘরে রক্ত-লাগা কাপড়-চোপড় ধুতে দেখেছে। সেই বাড়িটার উপর কড়া নজর রাখার ফলে, ১৯এ সেপ্টেম্বর সেই বাড়িতে গোপীর ভাই নিতাইকে কনষ্টেবলরা গ্রেপ্তার করে। সে সেখানে এসেছিল তার ভাইয়ের কথামত কতকগুলো কাপড়-চোপড় নিয়ে যেতে। নিতাইয়ের কথা মত মিঃ ঘোষাল হাওড়ায় গিয়ে এক জায়গা থেকে অতি কষ্টে গোপীকে গ্রেপ্তার করেন। গোপীর রক্ষিতা ডলির জবানবন্দী থেকে জানা যায় যে, ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রি একটার সময় গোপী ডলির ঘরে আসে রীতিমত মাতাল অবস্থায়। ডলি তাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে রেগে বলে, "চুপ্ কর, কাল সকালের কাগজে সব জানতে পারবি।" সকাল বেলায় গোপীর কাপড়ে রক্তের দাগ ডলির নজরে পড়ে এবং গোপী সেটা কেচে দিতে বলে। ১১ই সেপ্টেম্বর গোপী ডলিকে হাওড়ায় নিয়ে যায়। সেই রক্তের দাগ-লাগা কাপড়টা কেচে ডলি সেটা ট্রাঙ্কের ভিতর রেখে দেয়।

ডলির জবানবন্দী শোনার পর মিঃ ঘোষাল মিঃ রায়কে বলেন, "আমার মনে হয়, খেঁদাও দ্বিতীয়বার মলিনার বাড়ি গিয়েছিল রাত

একটায়। এ থেকে বুঝা যায় যে, গোপীও দেহ থেকে মুণ্ডুটা কাটার সময় খেঁদা ও কেষ্টর সঙ্গে ছিল।”

ডলির কথা অনুসারে সাব্-ইন্‌সপেক্টার মিঃ বি. এল. রায় তার ট্রাঙ্ক অনুসন্ধান করে সেই কাপড় উদ্ধার করেন, তাতে তখনও রক্তের অস্পষ্ট দাগ ছিল। কাপড়ের সঙ্গে একজন জ্যোতিষীর একখানা গণনা করা কাগজও পাওয়া যায়। তাতে লেখা ছিল : গোপী যদি অক্টোবর পর্যন্ত গ্রেপ্তার এড়াতে পারে, তা'হলে সে রক্ষা পেয়ে যাবে। গোপী পাগলাকে খুনের কথা স্বীকার করলো। গোপী, খেঁদা আর কেষ্টই প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল এই ব্যাপারে। পরে সুবল, কালী আর ভূপেনকে এর সঙ্গে জড়িয়েছিল তারা। গোপীর নির্দেশ অনুসারে মিঃ ঘোষাল কেষ্টর ভাই সুবলকে এবং পরে কালীকে গ্রেপ্তার করেন। তারা সকলেই পুলিস অফিসারের সামনে খুনের কথা স্বীকার করে। কিন্তু তাতে আসল আসামীর সন্ধানের পক্ষে বিশেষ কিছুই সাহায্য হয় না।

কেষ্ট আর খেঁদার মত দুই ঘাগী আসামী ফেরার থাকতে পুলিস নিশ্চিন্ত হতে পারে না। তার উপর খেঁদার কাছে আবার রয়েছে টোটা-ভরা রিভলবার। এই রকম দুর্দান্ত ফেরারীকে ধরতে হ'লে যে রকম তোড়জোড় দরকার তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার মিঃ পি. নর্টন জোন্সের অনুরোধে লালবাজার থেকে সে সকল ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। একটি সশস্ত্র পুলিসবাহী লরি, লোহার শিরস্ত্রাণ, অস্ত্রশস্ত্র, ঢাল ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়। এ সব ছাড়া যখন যা সুবিধার দরকার হেড-কোয়ার্টারস্ থেকে তাঁরা তা করে দেবেন ব'লে প্রতিশ্রুতিও দেন তদন্তকারী অফিসারদের।

এর পর পলাতক দুর্বৃত্তের অনুসন্ধানে মিঃ ঘোষাল ও তাঁর অনুচররা

এক হাতে রিভলবার ও অপর হাতে ঢাল নিয়ে রাতের পর রাত প্রতি আড্ডায় ঘুরে আসামীদের তল্লাস করতে থাকেন। কেবল কলকাতাতেই নয়, হাওড়াতেও—যখন যেখানে সন্দেহ হ'ত, আভাস পেতেন, তখনই তাঁরা ছুটতেন সেইখানে। কাজটা যে খুবই বিপজ্জনক ছিল তা বলাই বাহুল্য। আসামীরা মিঃ ঘোষাল ও মিঃ রায়কে ভাল কোরেই চিনতো; যেখানে সেখানে অতর্কিতে তাঁদের আক্রমণ করা আসামীদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব ছিল না, কিন্তু এঁদের পক্ষে অন্তরায় ছিল অনেক। প্রথমতঃ আসামীরা এঁদের অপরিচিত, দ্বিতীয়তঃ সন্দেহক্রমে এলোপাতাড়ি গুলিও এঁরা চালাতে পারেন না। এই হত্যাকাণ্ডের পর খেঁদা ও কেষ্ট দু'জনেই মরিয়া হয়ে উঠেছিল। প্রায়ই থানার কাছ দিয়ে তারা ঘোরাফেরা করত, কৃপানাথ লেনের বাড়িতেও আসত এবং সাক্ষীদের হুমকী দিয়ে যেত। তারা নাকি একদিন সেই ঘটনাস্থলেও গিয়েছিল। এটা তাদের নিছক্ দুঃসাহস না অপরাধ-মনোবৃত্তিরই প্রকাশ বলা কঠিন। অনেক সময় আসামীদের মনোবৃত্তিই নাকি তাদের অপরাধ অনুষ্ঠানের স্থানে টেনে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রেও সেটা সত্য হয়েছিল। এই সময় খেঁদা একদিন সন্ধ্যার পর রিক্সাওয়ালার ছদ্মবেশে থানার কাছে আসে। সৌভাগ্যবশতঃ এক উকিল ভদ্রলোক তার রিক্সার আরোহী ছিলেন। খেঁদা নাকি তাঁকে তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিয়ে বলেছিল, "খুব বরাৎ জোর মশাই, আমি আপনার জায়গায় কোন ইন্‌স্‌পেক্টার বা ওদের সংবাদদাতা হরিপদকে মনে করেছিলুম।"

খেঁদা মলিনাকে কিন্তু সত্যিই খুব ভালোবাসত। এই ভালোবাসা বা প্রেমের দুর্বার আকর্ষণ খেঁদাকে মলিনার কাছে টেনে আনবেই, এই বিশ্বাসে মলিনার উপর কড়া নজর রাখা হয়। একদিন রাত্রে অদ্ভুতভাবে

এদের বাঞ্ছিত মিলনও ঘটে। রাত্রে খেঁদা জানালা দিয়ে মলিনার ঘরে ঢোকে। সেদিন ভয়ে মলিনার ঘুম হয়নি, খেঁদাকে দেখেই সে চীৎকার করে ওঠে। পাহারারত কনষ্টেবলরা ছুটে আসে এবং মলিনার ঘরে ঢুকে দেখে কোথায় কে! সে জানালা দিয়েই সরে পড়েছে ততক্ষণে। জানালা থেকে লাফ্ মেরে নিচের রাস্তায় পড়ে পালাবার সময়, চারিদিকে লোক জড় হয়ে যায়। পাছে তারা তাকে ধরে ফেলে এই ভয়ে, তাদের দিকে তিন চারবার গুলি ছুঁড়ে খেঁদা গা-ঢাকা দেয়। এই ঘটনার পর থেকে তদন্তকারী পুলিস অফিসারদের আরও বেশী সতর্ক হতে হয়। চতুর্দিকে জোর অনুসন্ধান চলতে থাকে। তৎকালীন কলিকাতা পুলিসের সহকারী কমিশনার খোন্দকার ও রেজা সাহেবও এই কাজে সক্রিয় সহায়তা করেন।

এই সময় আর এক মজার ঘটনা ঘটে। বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়ে ১৯৩৬ সালের ২০এ সেপ্টেম্বর মিঃ ঘোষাল হাওড়ার একটি বাড়িতে অতর্কিত তল্লাস ক'রে একজন লোককে শায়িত অবস্থায় দেখতে পান। মিঃ ঘোষালের সংবাদদাতা তাকে দেখিয়ে ভয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলে, "স্যার, ঐ যে খেঁদা!" মিঃ ঘোষাল ও তাঁর অনুচরবর্গ রিভলবারের মুখে তাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করেন। লোকটা কোনপ্রকার বাধা দেয় না, শান্ত ভাবেই বন্দী হয়। মিঃ ঘোষালের সন্দেহ হয় লোকটা আসল খেঁদা কিনা। তাঁরা তাকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। দু'চার জন তাকে দেখে নিঃসন্দেহে খেঁদা বলেই সনাক্ত করে। পুলিস-গেজেটে প্রকাশিত তার ফটো-চিত্রের সঙ্গে মিলিয়েও বিশেষ তফাৎ টের পাওয়া যায় না। ঠোঁটের আর ভুরুর কাটা দাগ, বুকের উপর ফুল ও ব্যাঙের উল্কি, ডান হাতে নারকেল গাছ, সাপ প্রভৃতি লেখা সবই ছিল—যেমন ছিল খেঁদার। চেহারার মাপেও

আশ্চর্য রকম মিল, কিন্তু তবুও সে খেঁদা নয়! যারা খেঁদাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতো, তারাই ভালোভাবে দেখে শেষ পর্যন্ত বলে, "না, এ আসল খেঁদা নয়।" পরে জানা যায় লোকটা খেঁদার সহযোগী, তার গায়ে ঐ সব চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে দরকার হলে তাকে খেঁদা বলে চালানো যায়।

অকুস্থলে এবং তার আশপাশে কড়া পাহারা মোতায়েন করা হয়েছিল। ২২এ সেপ্টেম্বর তারিখে সৌভাগ্যক্রমে কেষ্ট পথে গ্রেপ্তার হয়। ঘটনাস্থলে, অথবা মলিনার বাড়ির দিকে যাচ্ছিল সে। একেবারে হাড় শয়তান কেষ্টটা! তার কাছ থেকে কোন রকমের জবানবন্দীই পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণে যাদের স্বভাব-অপরাধী বা জন্মগত-অপরাধী বলে, কেষ্ট হচ্ছে তাই। সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ ক'রে, কুসংসর্গে পড়ে' খুনে আসামীতে পরিণত হয়েছিল সে। সামান্য শিক্ষা তার ছিল, সুতরাং তার কাছ থেকে কোন কথা আদায় করতে হলে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে হয়। এই সব ভেবে-চিন্তে পুলিস অফিসার মিঃ ঘোষাল একদিন সন্ধ্যার পর তাকে তার ইচ্ছামত পেট ভরে খাইয়ে দিলেন। ভরা-পেটে মস্তিষ্কের কাজ ঢিমে হয়ে যায়। রাত বারটার পর, তাকে একটা আধা-অন্ধকার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘরের একদিকে অস্পষ্ট একটা আলো জ্বলছিল, না জ্বলার মতই। ঘরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আর সময়টা আসামীর মনে একটা ভৌতিক রহস্যের ভীতি এনে দিয়েছিল। মনকে প্রতারণা ক'রে তার ভিতর থেকে কিছু বার ক'রে নেওয়ার এইটিই ছিল উপযুক্ত সময়।

মিঃ ঘোষাল প্রথমেই ঘরের মধ্যে ঢুকে তাকে প্রশ্ন করতে শুরু করেন—তার বাল্যকাল, পারিবারিক জীবন ইত্যাদি বিষয়ে। আসল কথা জিজ্ঞাসা করার পূর্বে এই ধরনের আজেবাজে প্রশ্ন চলতে থাকে।

পাগলা খুনের মামলা

রাত্রি একটার পর মিঃ ঘোষাল বিশ্রাম করতে যান, কেষ্টর কাছে তখন থাকেন মিঃ রায়। মিঃ রায়ের অসীম ধৈর্য আর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে, রাত্রি দু'টোর পর কেষ্ট একে একে সমস্ত ঘটনা স্বীকার করতে আরম্ভ করে। কিন্তু ভোর হবার উপক্রম হতেই আর তার কাছ থেকে কোন কথা বার করা যায় না—তার জবাব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে সে। মিঃ রায় তখন উঠে আসেন তার কাছ থেকে। কেষ্ট তারপর আর কিছুই বলেনি। কিন্তু সেদিন সে হত্যাকাণ্ডও স্বীকার করেছিল এবং সহকারীদের নামও বলে দিয়েছিল। তাছাড়া আর একটি গোপন তথ্য প্রকাশ ক'রে সে পুলিসকে যথেষ্ট সাহায্য করে। ঐ সময়েই সে বলে ফেলে যে, খেঁদা দেওঘরে; কলকাতায় নেই। তার কাছ থেকে খেঁদার স্থিতি সম্বন্ধে এই খবরটাই সব চেয়ে মূল্যবান ছিল ঐ সময়ে।

কেষ্টর বিবৃতি অনুসারে মিঃ ঘোষাল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেওঘর রওনা হন। তাঁর সঙ্গে যান হরিপদ সরকার নামে স্থানীয় এক ভদ্রলোক। তাঁর মধ্যে গোয়েন্দাগিরি করবার ক্ষমতা ছিল। দেওঘরেই তাঁর বাসস্থান। ষ্টেশন থেকে কোন্ পথে যেতে হবে, কেষ্টকে দিয়েই তার একটা নক্সা করিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

এর পর হরিপদবাবুর চেষ্টায় এবং স্থানীয় পুলিসের সহায়তায় বিনা রক্তপাতেই খেঁদা একদিন দেওঘরের পথে পুলিসের হাতে ধরা পড়লো। তাকে গ্রেপ্তার করে তার বাসা "সন্ন্যাসী কুটীর"-এ হানা দিল পুলিস। খানাতল্লাসীর ফলে, তার ঘর থেকে একটা ছ'ঘরা টোটা-ভর্তি রিভলবার, ছ'টা অতিরিক্ত তাজা কার্তুজ, রক্তের দাগ-লাগা একটা ছোরা, 'এস' চিহ্নযুক্ত কাপড়চোপড় ও আরো কিছু গহনাপত্র পুলিস উদ্ধার করে। 'এস্' চিহ্নযুক্ত কাপড়চোপড় এখানেও পেয়ে পুলিস নিঃসন্দেহ হয় যে,

কৃপানাথ লেনে তার পৈতৃক বাড়িতে এবং ধোপার বাড়িতে যে সব 'এস্'
চিহ্নিত কাপড় পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলি সবই খেঁদার।

বহু চেষ্টার পর অবশেষে একদিন কলকাতার জনসাধারণ নিশ্চিন্ত হয় মনুষ্য সমাজের এই ভয়ঙ্কর শত্রুটি গ্রেপ্তার হয়েছে শুনে। বহু চুরি, ডাকাতি, লুঠতরাজ, খুনজখম, নরহত্যা প্রভৃতির নায়ক এই খেঁদাচন্দ্র। সে কোন জবানবন্দী দিতে রাজী হয় না, কিন্তু পুলিসের পক্ষে অভিযোগ প্রমাণের জন্য সেটা নেওয়ার বিশেষ দরকার ছিল। কথা-প্রসঙ্গে তার জবানবন্দী আদায় করার উদ্দেশ্যে তদন্তকারী অফিসার মিঃ ঘোষাল তাকে প্রশ্ন করেন, "তুমি নিহত লোকটার জন্য একটুও ভাব না?"

খেঁদা শান্তভাবে উত্তর দেয়, "একটুও না,—কেন ভাব্‌বো মশাই? সে আমার জীবনটাকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল, আমার মনের শান্তি হরণ করবার চেষ্টা করেছিল, আমার প্রাণের মলিনাকেও নিয়ে পালাবার চেষ্টায় ছিল। সেই জন্যেই ত' তার কাটা-মাথাটা ফেলে দেবার আগে মলিনার কাছে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে এসেছিলুম। সেই অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাস-ঘাতকী বোধ হয় আপনাকে সে কথা বলেনি?"

এই পর্যন্ত বলবার পর উদাস দৃষ্টিতে মিনিটকয়েক চুপচাপ থেকে খেঁদা মিঃ ঘোষালের কাছ থেকে একটা বিড়ি চেয়ে নিয়ে ফের বলে, "ওতে কিছু আসে যায় না, মশাই। জীবনটাকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করেছি আমি; প্রতি মুহূর্তকে ভোগ করেছি—তাই আজ আর অনুতাপের কিছু নেই আমার।"...

মিঃ ঘোষাল বিস্মিত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। খেঁদা কিছুক্ষণ নীরব থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে, তারপর আবার বলে

চললো, "কিন্তু স্যার, একটা ব্যাপার আমার মনটাকে বড়ই কষ্ট দিচ্ছে। অল্পদিন হ'ল আমি বিয়ে করেছি, আমার মৃত্যুর পর, আমার স্ত্রী যদি সাধারণ হিন্দু মহিলাদের মত বৈধব্য-জীবন যাপন না ক'রে, আমার মত পানাসক্ত হয়ে একটু ফুর্তি ক'রে জীবন কাটায় তবেই আমার আত্মা সুখী হবে। তা না হ'লে আমাকে আবার ফিরে আসতে হবে।"...

এ সবের কি উত্তর দেবেন মিঃ ঘোষাল! তবু সদরদে তিনি প্রশ্ন করেন, "তুমি কি ভগবানকে ভয় করো না?"

খেঁদা বলে, "যখন আপনি একটা ইঁদুর মারেন, তখন কি ঈশ্বরকে স্মরণ করেন?" প্রশ্ন ক'রে উত্তরের অপেক্ষা না করেই খেঁদা দার্শনিকভাবে বলে চলে, "আমাদের জীবনটা ঠিক মোটার গাড়ির মতই, পেট্রোল বন্ধ করে দিলেই গাড়ি থেমে যায়। মৃত্যুর পর অন্য কিছুতে আমি বিশ্বাস করি না। মৃত্যুকে সাধারণ যন্ত্রের মত হৃদ-যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াই মনে করি।"...

মিঃ ঘোষাল আরও কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন। আসল ঘটনা সম্বন্ধে কিছু তথ্য আদায় করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য, কিন্তু খেঁদা হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠে বলে, "আপনি দেখছি খুবই চালাক লোক; এই সব বাজে প্রশ্ন ক'রে আমার কাছ থেকে আসল ঘটনার বিবরণটা বের ক'রে নিতে চান—তাই না?" এইটুকু বলে সে আর কোন কথাবার্তাই আমল দেয় না এবং বিড়বিড় করে মিঃ ঘোষালকে গাল দিতে থাকে। তাঁকে বিদায় নিতে বলে খেঁদা নিজে নিজেই বলে ওঠে, "নারীর প্রেমে পড়েই চোর মরে, আর চোরকে বিশ্বাস করেই মরে নারী।"

খেঁদাও ছিল স্বভাব-অপরাধীর দলে এবং তার প্রকৃতি ছিল অত্যন্ত মরিয়া ধরনের। অনেক ক্ষেত্রে আমেরিকান "গ্যাংষ্টর"দের সঙ্গে তার তুলনা করা চলে।

মিঃ ঘোষাল দেওঘর পুলিসের উপর খেঁদাকে কলকাতায় পৌঁছে দেবার ভার দিয়ে নিজে ফিরে আসেন। কলকাতায় পৌঁছে প্রথমেই হাজতে গিয়ে কেষ্টর সঙ্গে দেখা করে খেঁদার গ্রেপ্তারের খবরটা তিনি তাকে দেন। কেষ্ট খবরটা শুনেই অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। তার মনের এই দুর্বল অবস্থার সুযোগে মিঃ ঘোষাল তাকে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করেন। কেষ্ট খুব অল্প সময়ের মধ্যে আপনা থেকেই তার জবানবন্দী দেয়। তাতে সে যা বলে তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে :

"...আমরা সকলে পাগলাকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে গরাণহাটা ষ্ট্রীট দিয়ে শিব-মন্দিরের পাশে আসতে-না-আসতেই পাগলা চীৎকার করে ওঠে, 'এরা আমায় মেরে ফেলবে!' ড্রাইভার সেই সময় গাড়িটা থামিয়ে দেয়। পথচারীদের মধ্যে সত্য গোয়ালা আর হীরা গোঁসাইকে চিনতে পারি, তারাও অন্যান্যদের সঙ্গে আমাদের গাড়িটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আর কারুকে চিনিনি। তারা জিজ্ঞাসা করলে, 'ব্যাপার কি?' খেঁদা বলে, 'তারা মাল খেতে যাচ্ছে, পাগলা নেশার ঝোঁকে চেঁচাচ্ছে।' আমরা ট্যাক্সিখানাকে ষ্ট্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোডে ছেড়ে দিই। সেখানে এক পুরনো পাপী গৌরীকে দেখতে পাই। সে সবেমাত্র নদী পার হয়ে ওপার থেকে সেখানে এসে পৌঁচেছে। খেঁদার কথায় গৌরী আমাদের সঙ্গে যেতে রাজী হয়। তারপর কালী মদ নিয়ে আসে। আমরা সকলেই মদ খাই। তখন খেঁদা বলে, 'এইখানেই পাগলাকে খুন করা যাক্!' গৌরীর সঙ্গে তখন কিছু চোরাই মাল ছিল, সে তাতে রাজী না হয়ে সরে পড়ে। খেঁদা তখন বলে, 'শালা পালালো, আচ্ছা দেখে নেব ওকে!' তারপর খেঁদা পাগলাকে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে, গঙ্গাজল খেয়ে শেষবার ভগবানের নাম করে নিতে বলে। পাগলা

তখন হতবুদ্ধি হয়ে গিছলো মনে হ'ল। সে শান্ত ভাবেই আমাদের সমস্ত হুকুম তামিল করে।

"তারপর, কোন রকমে বাধা দেবার চেষ্টা না করে সেই নর্দামা-গলির দিকে আমাদের অনুসরণ করে সে। সেখানে গিয়ে গোপী আর আমি পাগলাকে ধরি, অন্যান্য সকলেই কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। খেঁদা তখন ছুরি বার করে তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'এবার বল তোর শেষ ইচ্ছে কি—বলে ফেল ?'

পাগলা পাগলের মতই বলে, 'একবার মলিনাকে দেখতে দে।'

'তবে এই দেখ,' বলেই খেঁদা সজোরে তার তলপেটের উপর ঝকঝকে তীক্ষ্ণ ছোরাটা বসিয়ে দেয়। একবার নয়, দু'বার নয়, তিন তিনবার! সঙ্গে সঙ্গেই ছটফট করে লটকে পড়ে পাগলা। তারপর আমরা সবাই তাকে ধরাধরি করে খাটালটার মধ্যে রেখে দিই। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে, পোষাক পালটে, সকলে যে যার চলে যায়; কেবল গোপী, খেঁদা আর আমি ঘটনাস্থলে আবার ফিরে আসি, সঙ্গে নেপালীদের একখানা ভোজালি নিয়ে। খেঁদা মুণ্ডুটা ধড় থেকে কেটে ফেলে। গোপী সেটা মুড়ে চটের থলের মধ্যে পোরে। থলেটা আমি চুরি করেছিলুম একটা জায়গা থেকে। খেঁদা থলেটা নিয়ে গোপীকে সরে পড়তে বলে। তারপর আমার সঙ্গে গঙ্গার ধারে গিয়ে মুণ্ডুটা জলে ফেলে দেয়।

"সেই সময় এক সাধুবাবা ঘাটের ধাপে বসেছিলেন, কোলে একটা কুকুর নিয়ে। তিনি খেঁদাকে আগে থেকেই চিনতেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি ফেললে জলে ?' খেঁদা বলে, 'একটা মরা বেড়াল।' খেঁদার জুতোটা রক্তে ভিজে গেছে দেখে আমি তাকে গঙ্গার ধারে একটা খুপরিতে সেটা ছেড়ে যেতে বলি। জুতো ছেড়ে

আমার সঙ্গে খালি পায়েই সে তাদের কৃপানাথ লেনের বাড়িতে ফিরে আসে।

"পরদিন গোপী, খেঁদা আর আমি সেওড়াফুলি যাই। সেখানে গৌরীকে খুঁজে সেদিন তার পালিয়ে যাওয়া অপরাধের জন্য তাকে আমরা মার-ধোর করি। ফণী ব'লে একজন তাকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এলে, তাকেও ঘা-কতক দেওয়া হয়। তারপর ঠিক হয়, মলিনাকে যে-কোন উপায়ে ধরতে হবে। খেঁদা ঠিক করে যে, দরজা ভেঙে সে মলিনার ঘরে ঢুকবে, তারপর তাকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান ক'রে দড়ির সাহায্যে নাবিয়ে দেবে, আর আমি ট্যাক্সিতে তুলে নেব। শেষ পর্যন্ত এ মতলবটা ভেস্তে যায়, আমাদের কলকাতা ছেড়ে পালাতে হয়। খেঁদা আর আমি দেওঘর যাই। সেখানে একটা বাড়ি ভাড়া করি আমরা। খেঁদা নিজেকে স্থানীয় লোকদের কাছে কুমারটুলীর রাজা বলে পরিচয় দিয়েছিল, আর আমি সেজেছিলাম তার মন্ত্রী।"

যদিও পুলিস অফিসারের কাছে কেষ্টর এই স্বীকারোক্তি প্রমাণ হিসাবে গণ্য নয়, তবু এর দ্বারাই খেঁদা, গোপী ও কেষ্টর ভাগ্য প্রায় নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। এর সাহায্যে প্রধান সাক্ষী, সত্য গোয়ালা আর হীরা গোঁসাই, গৌরী, ফণী আর সাধুবাবার সন্ধান পাওয়া যায়। কেষ্টর এই স্বীকারোক্তিতেই খেঁদার রক্ত-লাগা জুতোজোড়া উদ্ধার করতে পারা গিয়েছিল, সেই স্থান থেকে। মলিনা আর তার বালক ভৃত্য জুতো জোড়া দেখেই খেঁদার বলে সনাক্ত করেছিল। এই জুতো সে পুরী থেকে কেনে। ঘটনার মাস ছয় পূর্বে মলিনাকে নিয়ে খেঁদা যখন পুরীতে বেড়াতে যায় সেই সময়।

পাগলা খুনের মামলা

ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে যখন আসামীদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় সনাক্ত করবার জন্য, তখন সত্য গোয়ালা আর হীরা, যাদের ট্যাক্সিতে দেখেছিল পাগলার সঙ্গে তাদের প্রত্যেককেই চিনতে পারে। কেবল পুরনো আসামী গৌরী বলে যে, সে নদী-তীরে খেঁদা, গোপী আর কেষ্টকে দেখেছিল পাগলার সঙ্গে, তারপর সে সরে পড়ে। সাধু কেবল খেঁদাকেই সনাক্ত করে বলেন যে, একটা থলেতে ক'রে কি একটা জিনিস নদীতে ফেলতে তিনি দেখেছিলেন মাত্র। সেই সময় আর একজন কালোমতন লোকও দূরে সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিল তার সঙ্গে, কিন্তু তিনি তাকে চেনেন না। পুলিসের কাছে কেষ্টর স্বীকারোক্তিতে এ ঘটনা আগেই আমরা জানবার সুযোগ পেয়েছি।

হাইকোর্টে যখন মামলার বিচার হয় তখন আসামী ভূপেন, কালী, সুবল আর নিতাইয়ের বিরুদ্ধে হত্যার ষড়যন্ত্রের অপরাধ প্রমাণ করতে পারা যায়নি। খেঁদা ষ্ট্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোডে যখন বলেছিল, 'এইখানেই পাগলাকে খুন করা যাক' এই উক্তিকেই ষড়যন্ত্রের সূত্র হিসাবে ধরা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বিচারে খেঁদার মৃত্যুদণ্ড সাব্যস্ত হয় এবং গোপী আর কেষ্টর হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

খেঁদার মৃত্যুদণ্ডাদেশের সঙ্গে সঙ্গেই এই রোমাঞ্চকর প্রণয়-ঘটিত হত্যা-নাট্যের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই নাটকের নায়ক হ'ল খেঁদা আর নায়িকা মলিনা; পাগলাকে এক্ষেত্রে নায়কের প্রতিদ্বন্দ্বী বলা চলে। মৃত্যুদণ্ডের সংবাদ শুনে মলিনা খুবই অভিভূত হয়ে পড়ে, এবং সাক্ষী দিয়ে ভালোবাসার অমর্যাদা বা প্রণয়ের প্রতিকূলতা করেছে ব'লে নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকে। পাগলা নাকি মলিনাকে খুবই ভালোবাসত। পুলিসের হেফাজত থেকে মুক্তি পেয়ে মলিনা খেঁদার পক্ষে একজন বড় ব্যারিষ্টার

নিযুক্ত করবার চেষ্টা করে। মিঃ ঘোষাল সে-কথা জানতে পেরে মলিনাকে জোর করবেন ঠিক করেছিলেন, কিন্তু মিঃ রায় তাঁকে বাধা দিয়ে বলেন যে, সেটা না করাই ভালো; কারণ স্ত্রীলোকের মন হেঁয়ালীতে ভরা, রহস্যময়। বাধা পেয়ে মলিনা পাগলের মত হয়ে গিয়ে হয়ত সমূহ মামলাই নষ্ট করে দিতে পারে।

এর পর খেঁদার ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে একটু আলোচনা করলে মন্দ হবে না। তার চরিত্রে যে বিশেষত্ব ছিল তা বলাই বাহুল্য। তবে কতকগুলি ব্যাপারে দলের অন্য সকলের সঙ্গে তার পার্থক্য ছিল অনেকখানি। তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, শহরের বারাঙ্গনাদের প্রতি তার সহানুভূতি। এমন কি তার সঙ্গীদের মধ্যেও যদি কেউ তাদের উৎপীড়ন করতো তা'হলে সে বাধা দিয়ে বলতো, "যখন আমাদের মত চোর গুণ্ডাদের পুলিসে কুকুরের মত খেদড়ে বেড়ায়, তখন কে আমাদের আশ্রয় দেয়?—কেউ না। কিন্তু এই হতভাগিনীরাই তখন আমাদের আশ্রয় দিতে, খাদ্য জোগাতে, এমন কি সাময়িকভাবে স্ত্রী হতেও কুণ্ঠিত হয় না। ওরা না থাকলে আমাদের জীবন ত' বিস্বাদ অসহনীয় হয়ে যেত!"

প্রকৃতপক্ষে বেশ্যালয়গুলিই, সাধারণ কামুক প্রকৃতির লোকের চেয়ে, এই সকল অপরাধীদেরই একমাত্র আরামের আস্তানা। তারা সেখান থেকেই বেরোয় কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে, আবার সেইখানেই সমাদৃত হয় যখন কাজ হাসিল করে বামাল নিয়ে ফিরে আসে।

বারবনিতাদের প্রতি খেঁদার এই ধরনের সহানুভূতিশীল মন থাকা সত্ত্বেও কেউ তাকে শেষ পর্যন্ত বিশেষ পছন্দ করত না, কারণ তার কাজ ছিল লুটপাট, হত্যা ও গুণ্ডামি যা পেশাদার বারবনিতাদের ব্যবসায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করত। সাধারণতঃ পয়সাওয়ালা ফুর্তিবাজ লোকদেরই

তারা পছন্দ করে বেশী। কিন্তু খেঁদা তাদের কাছ থেকেও জিনিসপত্র টাকাকড়ি ছিনিয়ে নিতে কুণ্ঠা বোধ করতো না। ফলে, সে সব লোক আর পা বাড়াতো না সেদিকে। এই কারণে, এই মামলায়, এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকরাও দলে দলে সাক্ষী দিয়েছিল খেঁদার বিরুদ্ধে।

ইন্‌স্‌পেক্টার রায় খেঁদার ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান ক'রে জানিয়েছিলেন যে, খেঁদা নাকি একবার কোন এক দরিদ্র মহিলার মেয়ের বিবাহে পাঁচশত টাকা দান করেছিল। আর একবার এক স্ত্রীলোককে সে বলেছিল যে, সে তাকে বাড়ি কেনার জন্য দশ হাজার টাকা দিতে পারে, যদি ঐ মহিলা তার বিনিময়ে নিজের ডান হাতের সামনের দিকে উল্কিতে লেখে, "আমার প্রাণের খেঁদা।" এই সব নানান দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, খেঁদা স্বভাব-অপরাধী হলেও, তার চরিত্রে আমাদের দেশের প্রচলিত ধর্ম ও সামাজিক অবস্থার খানিকটা প্রভাব ছিলই।

পাগলাকে হত্যা করা ছাড়াও, খেঁদার বিরুদ্ধে পুলিসের দপ্তরে অভিযোগের অন্ত ছিল না। বহু লোককে সে খুন করেছিল, মায় একজন পুলিস কনষ্টেবলকে পর্যন্ত। দরজা ভেঙে চুরির অপরাধের অভিযোগ ছিল বারো বার ; খুন করে চুরি দু'বার ; পুলিসের হেফাজত থেকে পালানোর অপরাধ দু'বার ; বহিষ্কার আদেশ লঙ্ঘন করে কলকাতায় প্রবেশ করার অপরাধ পাঁচ বার। ধরা-না-পড়ার অপরাধ যে কতবার ছিল তা কেউই জানে না। বহুবিধ অপরাধের এই দুর্ধর্ষ নায়কের ফাঁসি হয় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৩১এ জুলাই। সেদিন খেঁদা সকাল ছ'টায় ঘুম থেকে উঠে এক শিশি সুগন্ধি এবং কিছু ফুল চেয়েছিল তার শেষ ইচ্ছা হিসাবে। সে নাকি হাসিমুখেই মৃত্যুবরণ করেছিল।

সরকার পক্ষের ব্যারিষ্টার মিঃ এস. এম. বোস, পাবলিক প্রসিকিউটার মিঃ পি. জি. মুখার্জী, সলিসিটর মিঃ এস. চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে, পদস্থ পুলিস কর্মচারীদের অশেষ চেষ্টায়, উত্তর কলিকাতার নাগরিকরা খেঁদার মত দুর্দান্ত নরঘাতকের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে তাঁদের অজস্র ধন্যবাদ দিয়েছিলেন পুলিসকে। এই মামলা পরিচালনায় যে ডায়ারী ব্যবহার করা হয়েছিল, তার ওজন ছিল চার সের এবং দ্রষ্টব্য বস্তু ছিল একশ' বত্রিশটি।

সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত বহু যুগ কেটে গেছে, বহু পরিবর্তন এসেছে মানুষের জীবনে। দিনের-পর-দিন মানুষ এগিয়ে গিয়েছে সভ্যতার দিকে—উন্নততর জীবনের সন্ধানে। কিন্তু তবুও মানুষ কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাসের হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। কিছুকাল পূর্বেও, এমনি এক কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে, ধর্মের নামে, মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় স্ত্রীকে দগ্ধ ক'রে মারতেও মানুষ দ্বিধা করেনি—অসহায়া নারীকে তার স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাত-পা বেঁধে পুড়িয়ে মেরেছে!

সতীদাহ প্রথা রদের পরও, ১৯২৮ সালে বিহার প্রদেশের এমনি একটি বর্বরোচিত ঘটনা থেকেই এই কাহিনীর উৎপত্তি।

বিহার প্রদেশের ভার জেলার অন্তর্গত বেরনা গ্রামের কেশু পাণ্ডের কন্যা শমপতি কুঁয়ার। মেয়েটির বিবাহ হয় দশ বছর বয়সে সারথা গ্রামের সিদ্ধেশ্বর পাণ্ডে নামক এক ব্রাহ্মণ তনয়ের সঙ্গে। বিবাহের পূর্বে মেয়েটি যথারীতি পিতৃগৃহেই বসবাস করত। ১৯২৮ সালের আগষ্ট মাসে মেয়েটির স্বামী সিদ্ধেশ্বর রোগাক্রান্ত হয় এবং শমপতি অর্থাৎ ঐ মেয়েটি, স্বামীর সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য শ্বশুরালয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে ঐ বছরেই হতভাগিনীর কপাল ভাঙে, ২১এ নভেম্বর সিদ্ধেশ্বর মারা যায়। শমপতির বয়স তখন মাত্র কুড়ি বছর।

শমপতির পিতার মৃত্যু হয় এই ঘটনার বহু পূর্বেই। অভিভাবক বলতে তখন ছিল তার এক কাকা, নাম : কুলদীপ। বাল্যকাল থেকেই শমপতির স্বভাব ছিল অত্যন্ত নম্র ও ধর্মভীরু। তাছাড়া পুরোমাত্রায় পর্দানসীন বলতে যা বোঝায়, তাদের বাড়ির আবহাওয়া ছিল সেই ধরনের। শিক্ষাদীক্ষা বলতে তখনকার অনুপাতে ঐ ধরনের মানুষের যা থাকা সম্ভব—তার বেশী তার কিছুই ছিল না।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ২১এ নভেম্বর রাত্রে মেয়েটির স্বামীর মৃত্যু হয়। সেদিন শবদাহের উপযুক্ত ব্যবস্থাদি করা হয়নি ব'লে পরদিন ২২এ নভেম্বর সকালে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সহকারে শবদেহ সৎকারের জন্য শ্মশানের দিকে নিয়ে যাওয়া হতে থাকে। বিধবা শমপতিও এই দলের সঙ্গে শ্মশানের পথে শবানুগমন করে।

শমপতির তরফে ছিল পাচজন লোক। সতেরো বছরের মুরলীধর পাণ্ডে, মেয়েটির ভাই; কুড়ি বছর বয়সের জগদেও পাণ্ডে নামে তার দূর সম্পর্কীয় এক আত্মীয়; রঘু সিং নামক চল্লিশ বছরের এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ, আর গয়া পাণ্ডে।

অন্য তরফে, অর্থাৎ ভারের কুড়ি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত শমপতির শ্বশুরালয় সারথা গ্রাম থেকে আরও আটজন লোক এই সঙ্গে ছিল। তাদের মধ্যে, মৃত সিদ্ধেশ্বরের ষোল বছরের ভাই বিদ্যাসাগর পাণ্ডে; লছমন পাণ্ডে, বয়স আটচল্লিশ; সাহাদেও পাণ্ডে, বয়স পঁচিশ বছর; কিশো পাণ্ডে, বয়স বিয়াল্লিশ বছর। এ ছাড়া ছত্রিশ বছর বয়সী রামাউতার নামে এক চাকর, মুসাম্মত লখিয়া কাঁহারিণ নামে মেয়েটির এক দাসী ও আরো একজন লোক এদের সঙ্গে ছিল।

সারথা থেকে গঙ্গা খুব কাছে নয়, সেখানে পৌছতে রাত্রি প্রায়

ফুরিয়ে আসে। ভোর পাঁচটার সময় শবযাত্রার মিছিল প্রায় গঙ্গার তীরবর্তী হয় এবং শ্মশানের দিকে এগুতে থাকে। ঠিক এই সময় দৈবক্রমে রামনারায়ণ সিং নামে একজন রাজপুত পুলিস ঐ পথে যাচ্ছিল, সে এই শোভাযাত্রার জাঁকজমক দেখে, একটি অল্পবয়সী বিধবা স্ত্রীলোককে যে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা সহজেই বুঝতে পারে। কিন্তু একা তার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয় বিবেচনায়, রামনারায়ণ ভার থানায় গিয়ে তার উপরস্থ অফিসার নরুল হকের কাছে ঘটনাটি উল্লেখ করে। ঘটনাটি শোনা মাত্র নরুল হক, সুখলাল সিং নামক অপর একজন পুলিস ও রামনারায়ণকে সঙ্গে ক'রে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলের দিকে যাত্রা করেন এবং সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে, শবদাহকারীরা তখন পথিমধ্যে খাটুলি সমেত লাশ নামিয়ে বিশ্রাম করছে, এবং শমপতি মৃত স্বামীর পাশে অশ্রুসিক্ত নয়নে ব'সে।

শবানুগমনকারীরা তখন সতীর পুণ্যকামনায় মহাব্যস্ত। কনষ্টেবলরা প্রথমেই সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের এই অসৎ ও আইনবিরুদ্ধ কাজ থেকে বিরত হবার জন্য নানাভাবে উপদেশ দিতে থাকে, কিন্তু অতগুলি ধর্মান্ধ সদ্ব্রাহ্মণের মতামতের বিরুদ্ধে মাত্র তিনটি পুলিস কর্মচারীর যুক্তি-তর্ক-আইন এবং শেষ পর্যন্ত ভীতি-প্রদর্শনও বিশেষ কিছুই কাজে আসে না। এর পর নরুল হক্ সরকারী কোষাগারের পাহারাওয়ালা মহাবীর তেওয়ারী ও লছমী সিং নামে আরও দু'জন কনষ্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে এসে পুনরায় শবযাত্রীদের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এই সময় স্থানীয় পুলিসের বড় দারোগা লালবিহারী লাল ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হন, এবং তাদের এই ব'লে ভয় দেখান যে, তারা যদি এই কুৎসিত কাজ যা নারীহত্যারই সামিল, তা থেকে বিরত না হয়, তা'হলে

তাঁরা এই মৃতদেহ কেড়ে নিয়ে যাবেন এবং শবযাত্রীদের প্রত্যেককেই বে-আইনী সতীদাহের উদ্যোগ আয়োজনের জন্য অভিযুক্ত করবেন। শমপতিকেও বড় দারোগা লালবিহারী লাল এই আইন-বিরুদ্ধ কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে আত্মহত্যা না করতে বহুপ্রকার উপদেশ দেন। অবশেষে যে কোন কারণেই হোক ঘটনার মোড় ঘোরে। শমপতি এই সমস্ত ব্যাপারে তার নিবুদ্ধিতার কথা উপলব্ধি ক'রে 'খাটুলি' থেকে নেবে পড়ে। তখন উৎসাহিত শবযাত্রীরা সতীদাহে বিরত হয় এবং চার পাঁচ জন কাহার ও গোঁড়া পাণ্ডে ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ সংকারের জন্য শব তুলে নিয়ে শ্মশান অভিমুখে যাত্রা করে। ওখানে থেকে যায় শমপতি, তার ভাই মুরলীধর, জগদেও ও লখিয়া ঝি। তারপর তারা গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তনের জন্য একখানি এক্কাগাড়ি ভাড়া করে চলতে থাকে। হতভাগিনী বিধবা শমপতি মনে করে যে, সে তার পিতৃগৃহেই ফিরে চলেছে, এবং এ সম্পর্কে পুলিসও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, তারা শেষ পর্যন্ত এই জঘন্য ব্যাপারের একটা সুমীমাংসা ক'রে দিতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু মৃত্যু যার বিধিলিপি পুলিস তাকে কেমন করে রক্ষা করবে! কেউই তারা তখন কুসংস্কারাচ্ছন্ন পাণ্ডে ব্রাহ্মণদের ষড়যন্ত্রের কথায় সন্দেহ করতে পারেনি।

বলা বাহুল্য লোক-মুখে এই সতীদাহের খবর তখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার উপর পুলিসের হস্তক্ষেপে গোলযোগের সৃষ্টি হওয়ায়, ঘটনাস্থলেই প্রায় চার পাঁচ হাজার লোক জড়ো হয়েছিল। সদ্য-বিধবা শমপতি তার পিতৃগৃহে ফিরে যাবার জন্য এক্কায় উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিরাট জনতা 'সতী মাতা কি জয়!' ধ্বনি করতে করতে গাড়ির পেছনে পেছনে চলতে থাকে। তখনকার সময় এ-সব ব্যাপারে গ্রাম্য

লোকের কৌতূহলের অন্ত ছিল না! ক্রমশঃ যতই বেলা বাড়তে লাগলো, আশপাশের লোকজন কাতারে কাতারে এসে দাঁড়াতে লাগলো পথের ধারে—অনুসরণ করতে লাগলো এক্কাখানিকে। শমপতিকে দেখবার জন্যে, তাকে একবার স্পর্শ করবার জন্যে মেয়েদের হুড়োহুড়ি পড়ে গেল এক্কার সামনে।

এই ভাবে খানিকটা পথ অতিক্রম করার পর একটা চৌমাথার মোড়ে, যেখান থেকে শমপতি তার গ্রামের পথ ধরবে, ঠিক সেই জায়গায় হঠাৎ গাড়িটা এসে দাঁড়িয়ে গেল এবং অপর রাস্তা দিয়ে শবযাত্রী পাণ্ডারা আবার এসে শমপতির সঙ্গে মিলিত হ'ল সেইখানে। শব নিয়ে অবশ্য কয়েক জন তখন শ্মশান ঘাটের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। পাণ্ডে ব্রাহ্মণরা শেষ পর্যন্ত আবার সেই বিরাট জনতার সাহায্যে মুষ্টিমেয় পুলিসের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে এক্কাসমেত শমপতিকে নিয়ে শ্মশানের দিকে মোড় ফিরলো।

সেবার তাদের বাধা দেবার সময় পুলিসের এই দলে ছিল একজন ইন্‌স্‌পেক্টার, পনেরো জন কনষ্টেবল এবং দু'জন জমাদার। প্রথম দিকে পুলিস আবার ভালোভাবে শমপতিকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য পাণ্ডে ব্রাহ্মণদের অনুরোধ করে, এবং শমপতিকেও ঘরে ফিরে যাবার জন্য বোঝাতে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ শমপতিকে তখন সতী হবার মোহ বেশ খানিকটা পেয়ে বসেছিল। তাছাড়া এই অগণিত গ্রাম্য লোকের জয়ধ্বনি ও ঐ সব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের উৎসাহে তার খানিকটা বিশ্বাসও জন্মেছিল যে, সে মহাপুণ্য কাজ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কোন রকমে একবার যদি সে তার মৃত স্বামীর শবের সঙ্গে চিতার উপর গিয়ে বসতে পারে, তা'হলেই দৈবশক্তির প্রভাবে চকিতে সে'ও তার মৃত

স্বামীর দেহ অগ্নিরাজের জঠরে বিলীন হয়ে যাবে—এতে কোন জ্বালা যন্ত্রণা বা কষ্ট সে বোধ করবে না, এবং তারপরই হবে সে প্রভূত স্বর্গসুখের অধিকারী।

শেষ পর্যন্ত শমপতির এক্কা যখন থানা থেকে চার পাঁচশ' গজ দূরে, তখন পাণ্ডারা জোর ক'রে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের ষড়যন্ত্র মত এক্কাটিকে নিয়ে শ্মশানঘাটে এসে উপস্থিত হয়। উত্তেজিত ধর্মান্ধ জনতার বিরুদ্ধে পথিমধ্যে বাধা-প্রদানে অক্ষম হয়ে, পুলিস পুনরায় দলবদ্ধভাবে শ্মশানঘাটে যায়, কিন্তু সেখানে গিয়েও তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়—তাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। মুষ্টিমেয় পুলিসের সাহায্যে হাজার হাজার মারমুখী জনতাকে এই দুষ্কার্য থেকে নিবৃত্ত করা অসম্ভব হয়। এক্কাসমেত শমপতি শ্মশানঘাটে উপস্থিত হবার প্রায় ঘণ্টাখানেক পূর্বেই মৃতদেহটি সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল, এবং সেটিকে যথাবিহিত দাহ করার আয়োজন ব্যবস্থাও তখন প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছিল। বিরাট জনতা পরিবেষ্টিত 'সতী' শমপতি সেখানে উপস্থিত হলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে গঙ্গায় স্নান করিয়ে আনা হয়, এবং তার সর্বাঙ্গে গব্যঘৃতের প্রলেপ মাখিয়ে চিতায় বসাবার ব্যবস্থা করা হয়। তার গায়ে সামান্য যে সব অলঙ্কার ছিল সেগুলিও সমস্ত খুলে নেওয়া হয় সেই সময়।

সতীলক্ষ্মী শমপতির জয়গানে চতুর্দিক তখন মুখরিত। এই মহাপুণ্য-কার্যে নিজেকে উৎসর্গিত করবার জন্য ধীরে ধীরে চিতার কাছে এগিয়ে যায় শমপতি। নিরাভরণ দেহ, পবিত্র গঙ্গাস্নানে সমস্ত শারীরিক গ্লানি তার ধুয়ে মুছে গেছে। পরিচারিকার সঙ্গে স্বামীর সহমরণে যাবার সম্পূর্ণ প্রসাধনে সজ্জিত শমপতি এসে দাঁড়ায় চিতার সামনে। তিনজন যুবক চিতার উপর সিদ্ধেশ্বরের শবকে তখন শুইয়ে দিয়েছে; কর্ণবিদারী শব্দে

সতীদাহ রহস্য

মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি উঠছে : 'সতী মায়ি কি জয়!'—ধর্মের নামে জীবন্ত স্ত্রীকে দগ্ধ করা হবে মৃত স্বামীর সঙ্গে! তার কোন অপরাধ নেই, সত্যিই হয়ত সে মরতে চায় না, বৈধব্য-যন্ত্রণা নিয়েই হয়ত চায় বেঁচে থাকতে, কিন্তু তবুও তাকে সহমরণে যেতে হবে এবং সেইটাই হবে ইহজীবনে তার পক্ষে সব চেয়ে গৌরবের। আর তা না হলেই কলঙ্কের কালীয় দহে তাকে ডুবে মরতে হবে—বাঁচা হবে তার পক্ষে অত্যন্ত অগৌরবের। সে এক বীভৎস ভয়াবহ দিন গিয়েছে হিন্দুনারীর পক্ষে! আজ এই করুণ দৃশ্যের কল্পনা করতেও মানুষের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে—বেদনায় চোখে জল আসে।

পরনে লালপাড় শাড়ী, পায়ে আলতা ও সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে সতী শমপতি চিতার উপর স্বামীর মৃতদেহ কোলে নিয়ে বসলো। এর পরই দৈববলে আগুন জ্বলে উঠবে এবং সতী অগ্নির লেলিহান শিখার অভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে নিমেষে স্বর্গদ্বারে গিয়ে উপস্থিত হবে! নদীর তীরে চরের উপর শ্মশানঘাটে উপস্থিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনতা এই দৈব-ঘটনা ও পুণ্য-পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখবার জন্যে তখন অপেক্ষারত। সামনে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা বয়ে চলেছে কুল কুল শব্দে আর সমবেত নরনারীর উল্লাসধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ওপার থেকে। কেউ ছুটে গিয়ে ছুঁয়ে আসছে চিতার কাঠ, কেউ বা দূর থেকে ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছে চিতার উপর। এই সময় কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলো শমপতি ; কি হবে, কি ঘটবে, কিছুই যেন বোধ ছিল না তার। কখন সেই দৈব-আগুন জ্বলে উঠবে এবং কি ভাবে জ্বলে উঠবে শুধু সে কেন কেউই তা জানতো না।

যাই হোক, এই দৈবঘটনা কি ভাবে সংঘটিত হ'ল এখানে বিশদভাবে

না বললেও, পরে তা বিচারকদের নিজস্ব উক্তি ও বর্ণনা থেকেই পরিষ্কারভাবে আমরা জানতে পারবো।

পুলিস কিন্তু সম্মুখযুদ্ধে এদের সঙ্গে অকৃতকার্য হ্লেও, একেবারে এখান থেকে সরে যায়নি। জনতার ভেতর থেকেই নিখুঁত দর্শক হিসাবে পাণ্ডেদের সব কাজই লক্ষ্য করছিল তারা। তাছাড়া এটা পাণ্ডেরা ভালোভাবেই জানতো যে, তারা নিজেরা যদি চিতায় আগুন দেয়, তা'হলে নিশ্চিত তাদের ফাঁসি-কাঠে ঝুলতে হবে এবং জনসাধারণও ব্যাপারটা যে দৈববলে ঘটছে বলে বিশ্বাস করবে না। একমাত্র সতীলক্ষ্মীর পুণ্যবলেই যা সম্ভব, তা সাধারণ মানুষের দ্বারা সংঘটিত হ'লে আর দৈবের মহিমা থাকে কোথায়?

এই ব্যাপারে লখিয়া ঝি শমপতিকে সাহায্য করছিল তার প্রসাধনের ব্যাপারে। বাকী সব কিছুই লছমনের তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশ মত মুরলীধরের দ্বারা সমাপ্ত হচ্ছিল। শমপতি তখনো ঠিক বসেছিল একই ভাবে। হয়ত প্রতীক্ষা করছিল কখন সেই দৈব-অগ্নি জ্বলে উঠবে তারই জন্য। হঠাৎ সেই সময় পাণ্ডে ব্রাহ্মণদের কয়েকজন চতুর্দিক থেকে এসে সেই চিতাকে ঘিরে চীৎকার করে উঠলো সতীর জয়গান ক'রে, আর তার সঙ্গে সঙ্গেই চিতার চার দিকে অকস্মাৎ আগুন জ্বলে উঠলো দাউদাউ করে! বারুদের গায়ে দেশলাই কাঠি পড়লে যেমন হয়, পেট্রোলে আগুনে ছোঁয়াছুঁয়ি হলে যে কাণ্ড ঘটে, তেমনি জ্বলে উঠলো চতুর্দিক থেকে! গ্রামের মেলায় বাজীকরদের সাধারণ হাত-সাফাইয়ের ফলে যেমন হয়, যেভাবে চালাকীর সাহায্যে তারা অদ্ভুত সব অঘটন ঘটায়, এখানেও পাণ্ডে ব্রাহ্মণরা তেমনি কিছু যে একটা ঘটালো তাতে আর সন্দেহ নেই। প্রচণ্ড অগ্নির শিখা শমপতির সর্বাঙ্গ

ঝলসে দিয়ে উর্ধ্বে আকাশের দিকে ঠেলে উঠলো। অবলা অসহায়া শমপতি দাহের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে, চীৎকার করে চিতা থেকে লাফিয়ে উঠে, গঙ্গার জলে গিয়ে ঝাঁপ দিলে। জলের মধ্যে পড়ে জ্বালা জুড়াবার চেষ্টা করলে শমপতি।

ঘটনার এবংবিধ পরিস্থিতিতে সব চেয়ে মুস্কিল হ'ল পাণ্ডে দলের। কারণ, কোন রকমে মেয়েটি এখন বেঁচে গেলে, তাদের সমস্ত অভিসন্ধি প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং হয়ত ফাঁসি-কাঠেও ঝুলতে হবে। তাছাড়া এই অঘটনের পর আবার নতুন ক'রে চিতায় অগ্নি-সংযোগের খেলা দেখানোও তাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। কাজেই, মেয়েটিকে কোন রকমে এখন ডুবিয়ে মারতে হবে, তারা তখন মনে মনে এই সঙ্কল্প করলে এবং ঐ শবদেহ-সমেত শমপতিকে আরও গভীর জলের মধ্যে ঠেলে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। তাদের ধারণা ছিল, এইভাবে কিছুক্ষণ জলের মধ্যে হাঁকপাক করার ফলে নিশ্চিত তার মৃত্যু ঘটবে এবং কুমীরের গর্ভে সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু শমপতির ভাগ্যে তাও ঘটলো না। উপর থেকে ধর্মান্ধ পাণ্ডেদলের সমর্থকরা তাকে চীৎকার করে ডুবে মরার জন্যে বলতে লাগলো। এই সময় পুলিস আর স্থির থাকতে পারলো না। তারা ঐ মারমুখী জনতার বিরুদ্ধেই নৌকার সাহায্যে জল থেকে শমপতিকে অত্যন্ত সঙিন অবস্থায় উদ্ধার করলো। তার সর্বাঙ্গ তখন অগ্নিদগ্ধ এবং দেখে মনে হ'ল প্রাণবায়ু বেরুতেও বোধ হয় আর বেশী দেরি নেই! গঙ্গার তীর থেকে কয়েক পা উঠেই একটি মন্দিরের কাছে গাছতলায় মেয়েটি শুয়ে পড়লো—আর যেতে পারলো না। এই সময় স্থানীয় এক ডাক্তার ইন্‌জেকসন্ দিয়ে মেয়েটির যন্ত্রণার যাতে উপশম হয় সেজন্য এগিয়ে আসে, কিন্তু বিরুদ্ধভাবাপন্ন লোকেরা তাকে ভয় দেখিয়ে চলে

যেতে বাধ্য করে। এর পর পুলিস মেয়েটিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার চেষ্টাতেও অকৃতকার্য হয়, দলবদ্ধ জনতার আক্রমণে তারা বাধ্য হয়ে ঐ স্থান ত্যাগ ক'রে সদর থানায় খবর পাঠায়।

দু'দিন দু'রাত্রি ধরে মেয়েটি ঐ উন্মুক্ত স্থানে গাছের তলায় বিনা চিকিৎসায় ও বিনা শুশ্রূষায় যন্ত্রণাভোগ করতে থাকে। অবশেষে মহকুমা হাকিম অস্ত্রসজ্জিত পুলিসের সাহায্যে নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মৃতপ্রায় মেয়েটিকে চিকিৎসার জন্য জেলের মধ্যে নিয়ে আসেন। ২৫এ নভেম্বর ঐখানেই মেয়েটির মৃত্যু ঘটে।

এই ব্যাপারে পাণ্ডে ব্রাহ্মণদের দুরভিসন্ধি সম্পূর্ণ না হলেও, আংশিক-ভাবে কিন্তু পূর্ণ হয়। কারণ দু'দিন দু'রাত্রি ধরে যখন মেয়েটি যন্ত্রণা ভোগ করে, তখন তার কাছাকাছি গঙ্গার তীরটি একটি পবিত্র তীর্থস্থানে পরিণত হয় এবং অজস্র পয়সা ও ফুলের স্রোত বইতে থাকে সেখানে। সতীলক্ষ্মীর স্মৃতির উদ্দেশে ঐ স্থানে সঙ্গে সঙ্গে একটি বেদীও তৈরি করা হয় এবং বলা বাহুল্য যা-কিছু 'অর্থ সংগৃহীত হয়, তা সমস্তই যায় পাণ্ডে ব্রাহ্মণদের টেঁকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই পয়সায় তাদের আত্মতৃপ্তি বা সুখভোগের কিছুই সুযোগ হয়নি,—কয়েক দিনের মধ্যেই এই গর্হিত ধর্মান্ধতার যথোচিত পুরস্কার মিলেছিল তাদের ভাগ্যে। পুলিস দলের চাঁইদের সকলকেই গ্রেপ্তার করেছিল একে একে।

শমপতিকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ড-বিধির ১৪৯ ও ৩০৬ ধারা অনুযায়ী পাটনা নিম্ন আদালতে তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়। আসামীর সংখ্যা ছিল সবসুদ্ধ ষোল জন। এদের মধ্যে জুরিদের সঙ্গে একমত হয়ে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছ'জনকে খালাস দেন এবং অপর দশ জনের সম্বন্ধে ভিন্নমত হওয়ায় মামলা হাইকোর্টে পাঠান হয়।

সতীদাহ রহস্য

পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার কোর্টনে টেরেল ও বিচারপতি এড্যামির এজলাসে এই মামলার বিচার আরম্ভ হয়। আসামী পক্ষ তাদের বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে এবং তাদের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এই বিষয়ে প্রধান বিচারকের মতামত বিশেষ দ্রষ্টব্য। তিনি বলেন যে, "যেহেতু এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে আসামীরাই চিতায় অগ্নি-সংযোগ করেছে বা তারাই মেয়েটিকে পুড়িয়ে মেরেছে, সে-কারণ তাদের ১০৭ ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু এইস্থানে নিজের হাতে চিতায় অগ্নি-সংযোগ করা বা না করাকে অন্যায় বলে ধার্য করা হচ্ছে না, মেয়েটিকে তার স্ব-ইচ্ছায় আত্মহত্যা করতে সাহায্য করার জন্যই আসামীদের দোষী বলে সাব্যস্ত করা হচ্ছে। যে উপায়ে মেয়েটির মৃত্যু ঘটেছে, সেই উপায়টিই এক্ষেত্রে অগ্নি; কাজেই সেই অগ্নি দৈববলেই প্রজ্বলিত হোক বা স্বহস্তেই মেয়েটি অগ্নি জেলে দিক, বা অন্য কোন উপায়েই অগ্নি জ্বলুক, তা এখানে আমাদের বিচার্য বিষয় নয়, এবং এ-বিষয়ে অধিক আলোচনাও নিষ্প্রয়োজন।"...

এ ছাড়া আসামী পক্ষ আরও বহুবিধ উপায়ে নিজেদের নির্দোষ ব'লে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে। তারা বলে যে, পুলিস কোন বিশেষ ব্যক্তিকে আসামী বলে সনাক্ত করতে সমর্থ হয়নি—পুলিসের ডায়েরীতে কোথাও আসামীদের নাম লেখা নেই এবং পুলিসের সাক্ষীর মধ্যেও কয়েকটি উল্টোপাল্টা উক্তি ধরা পড়েছে।

এই সকল উক্তির উত্তরে মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেন, "তা'হলে এটাই বোঝা যায় যে, এই বিষয়ে যা কিছু প্রমাণ সাক্ষ্য বা বর্ণনা পাওয়া গিয়েছে, তা সবই পুলিসের তৈরি গল্প। এটা নিতান্তই

অবিশ্বাস্য এবং এ নিয়ে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বরং একথা বলা যেতে পারে যে পুলিস নিজ কর্তব্য স্থির করতে বিলম্ব না ক'রে, সময় থাকতে কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করলে মেয়েটিকে হয়ত বাঁচাতে পারত। কিন্তু এর জন্য পুলিসের সাক্ষীর বিরুদ্ধে একটি কথাও বলা যায় না। আমাদের মতে পুলিস যা করেছে, তা বীরত্বের সঙ্গে সদিচ্ছা নিয়েই করেছে এবং এই কার্যে তারা তাদের যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে।"

এই মামলায়, এক্কা গাড়ির চালক রামাউতার দুসাদ এবং লখিয়া ঝি-কে এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। মাননীয় বিচারক লখিয়া ঝি-র সম্বন্ধে বলেন, "কুসংস্কার, অজ্ঞানতা এবং ঘটনাকালের অবস্থার প্রভাবে চালিত হয়ে সে এই সব কাজ করেছে, এবং একথা বেশ বুঝতে পারা যায় যে, সে মনে প্রাণে ঐ দৈব-অগ্নি সংযোগের কথা বিশ্বাস করতো।"

শমপতির ভাই সতেরো বছরের মুরলীধর পাণ্ডে এবং মৃত সিদ্ধে-শ্বরের যোল বছরের ভাই বিদ্যাসাগর পাণ্ডে, এদের দু'জনেরই পাঁচ বৎসর ক'রে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। বিচারপতি এদের সম্বন্ধে বলেন, "এই অল্পবয়স্ক যুবকদ্বয়কে কিছুকালের জন্য আমরা যদি এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন আবহাওয়া থেকে সরিয়ে রাখতে পারি, তা'হলেই এরা যখন বড় হয়ে উঠবে তখন নিজেদের বিচারবুদ্ধির দ্বারা এই সব বর্বরোচিত কাজ থেকে মুক্ত হতে পারবে। এরা এখনও সত্যিই অল্পবয়স্ক এবং এদের শোধরাতে পারা সম্ভব।"

জগদেও-এর ভাগ্যে ঘটে সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড। এছাড়া ছলমন্, হরদেও, সাহাদেও, কিশো এবং ভূমিহার-ব্রাহ্মণ রঘু সিংকে দীর্ঘ দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

এই মামলার সমাপ্তিকালে বিজ্ঞ বিচারক একটি মর্মস্পর্শী এবং জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেন। মামলা সম্পর্কে মাননীয় প্রধান বিচারপতির এই শেষ উক্তি যেমন উপদেশাত্মক তেমনি প্রত্যেকের পক্ষেই পাঠযোগ্য।

তিনি বলেন, "শাস্তি দ্বারা আমরা কেবলমাত্র স্থূল দেহটাকেই দুঃখ দিতে পারি, কিন্তু তাতে মনের পরিবর্তন হয় কিনা বলা শক্ত। তবু এখানে এই সব কুকর্মকারীদের উপযুক্ত শাস্তিবিধান করা আমার কর্তব্য। যতদূর সম্ভব এই নিষ্পাপ, অজ্ঞান মেয়েটির মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া, এবং যারা যুক্তির দ্বারা কোন কিছু শিক্ষালাভ করতে সক্ষম নয়, তাদের ভীতি-প্রদর্শনের দ্বারা শিক্ষা দেওয়াই উপস্থিত আমাদের চরম বিচার। সেই বিচারের মানদণ্ডেই এখানে আমি এদের শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করেছি।

"মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা ব'লে অবিনশ্বর কিছু আছে কিনা তা আমি জানিনা, কিন্তু এই তত্ত্ব যদি সত্য হয়, এবং ন্যায় ও ক্ষমার অর্থ আমরা ভুল বুঝলেও ঈশ্বর যদি ন্যায়পরায়ণ ও ক্ষমাবান হন, তা'হ'লে সেই সব ব্যক্তি যারা আজ এই নৃশংস ঘটনার মধ্যে থেকেও, ভাগ্যক্রমে, মানুষের দেওয়া শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, তারা যেন সকলেই অবনত মস্তকে শমপতির ফুলচন্দনমণ্ডিত বেদী অভিমুখে তীর্থ-যাত্রী হয়, এবং সেই বেদীমূলে শমপতির নিষ্পাপ ও শান্তিময় আত্মার সমীপস্থ হয়ে নিজ নিজ পাপাত্মার চির-নরকবাসের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করে।"

আপন আপন রাজ্যের মধ্যে রাজা-রাজাড়াদের অত্যাচারের অনেক কাহিনীই আমরা শুনেছি। কতো রাজাই যে তাঁদের জমিদারীকে শেষ পর্যন্ত যৌন-লালসা চরিতার্থের শিকারক্ষেত্র করে তুলেছেন এবং প্রজারা তাদের মেয়ে-চুরির স্থায়ী আতঙ্ক নিয়ে দিন কাটিয়েছে, সেকথাও অনেকে জানেন। ইন্দোরের মমতাজ-হরণ কাহিনী আজ কারুর কাছেই অজ্ঞাত নয়। সে-কাহিনীও পাঠক এই বইয়ের মধ্যে পাবেন। ভয়াবহতা ও পাশবিকতার দিক থেকে এটিও প্রায় সেই ঘটনারই সমতুল্য। কাহিনীটি অপ্রত্যাশিতভাবে পাটনা হাইকোর্টে স্যার কোর্টনে টেরেল ও স্যার খাজা এম. নুরের সমক্ষে একটি দেওয়ানী আপীলে উদ্‌ঘাটিত হয়। আসল ফৌজদারী মামলাটির বিচার দুর্ভাগ্যবশতঃ এক অযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়েছিল। যে সমাজ-সংস্কারকের দল অপরাধীর শাস্তিবিধান করতে চেয়েছিলেন, তিনি তাদের বিরুদ্ধেই এই মামলার রায় দেন। এই বিচারের ফলাফলের উপর যদিও আপীল হয়নি, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে রাজা ঐ ফৌজদারী মামলায় জয়লাভ ক'রে, সেই সমাজ-সংস্কারক দলের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক একটা মামলা দায়ের ক'রে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। নিম্ন আদালতের বিচারক রাজার পক্ষে সর্বসমেত ৬৯৯৯৲ টাকা ক্ষতি-পূরণের দাবি মঞ্জুর করেছিলেন। সংস্কারক দল তখন এই উদ্ভট

বিচারের বিরুদ্ধে পাটনা হাইকোর্টে আপীল করলে এই পৈশাচিক কাহিনীটি বিশদভাবে জনসাধারণে প্রকাশলাভের সুযোগ ঘটে।

১৯৩৬ সালের কথা। উড়িষ্যার আউল রাজ-ষ্টেটের অন্তর্গত ছত্র-চাকদা গ্রামের অধিবাসী হরেকৃষ্ণ মাহান্তি ছিল জাতিতে কাড়ান। তার প্রথম পত্নীর গর্ভে দুই কন্যা হয়। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করে। তার দুই কন্যার মধ্যে বড়টির নাম ছিল কনক। কনকের বয়স হয়েছিল মাত্র বারো কি তেরো এবং সে ছিল সত্যিকার স্বাস্থ্যবতী ও সুন্দরী। পল্লীগ্রামের অত্যন্ত সাধারণ ঘরের মেয়ে যে কি ক'রে এমন রূপ পেয়েছিল তা একটা ভাববার বিষয়। তাছাড়া শুধু রূপ নয়, দেহের গঠনভঙ্গীও ছিল তার অপূর্ব। এই অল্প বয়সে, তখনো তার কুমারীত্ব উত্তীর্ণ না হলেও, তাকে দেখে দুশ্চরিত্র লোকের ত' বটেই, এমন কি সাধারণ লোকের পক্ষেও তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কিছু বিচিত্র ছিল না।

রাজা ব্রজসুন্দর দেব ছিলেন কটক জেলার একজন ধনী জমিদার। সাধারণতঃ আউলের রাজাই তাঁকে বলা হ'ত। আউল এককালে উড়িষ্যার স্বতন্ত্র করদ রাজ্যগুলির অন্যতম ছিল, কিন্তু এখন সেটা একটা জমিদারী ষ্টেট মাত্র।

ছত্র-চাকদা গ্রামের অধিবাসী যুগলকিশোর দাসও ছিল জাতিতে কাড়ান। একদিন সে জানতে পারে যে, ১৯৩৬ সালের ১৯এ সেপ্টেম্বর তারিখে আউল রাজের দু'জন কর্মচারী, রাজার এক চাকর, একজন দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় এবং মনগোবিন্দ ধল ব'লে আর একজন—এরা হরেকৃষ্ণ মাহান্তির কাছ থেকে তার বার তের বছরের মেয়ে উক্ত কনককে আউল-রাজের ভোগ-লালসা পরিতৃপ্তির জন্য মাত্র পাঁচ শ' টাকায়

কেনবার প্রস্তাব করে, এবং আরও জানতে পারে যে, ঐ হরেকৃষ্ণ সেই টাকাতেই বালিকাকে রাজার দূর-সম্পর্কীয় এক আত্মীয়কে বিক্রয় করে। সেখান থেকে মনগোবিন্দ ও আরো অন্যান্য কয়েকজন রাজ-পরিচারকবৃন্দ উক্ত বালিকাকে আউল-রাজের নিকট নিয়ে যাবার জন্য পাল্কী-বেহারার ব্যবস্থা করে। কিন্তু উক্ত অসহায়া বালিকা তার অবস্থা উপলব্ধি করে কাঁদতে থাকে এবং এই ষড়যন্ত্রকারী চরিত্রহীন লোকদের হাত থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য নানা চেষ্টা করে। কিন্তু নাবালিকার সকল প্রচেষ্টা, ক্ষণিকের বুদ্বুদের মত অচিরাৎ ভেঙে যায়,—জোর জবরদস্তি ক'রে রাজার লোকেরা, মনগোবিন্দের তত্ত্বাবধানে সহজেই তাকে আউল-রাজের সমক্ষে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই কানে কানে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। গ্রামের যুবক যুগলকিশোরের কানেও এ খবর পৌঁছতে দেরি হয় না। সে তার প্রতিবাসীদের অধঃপতনে অধীর হয়ে বালিকাকে দুশ্চরিত্র রাজার কবল থেকে মুক্ত করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এর পর যুগলকিশোর, তার পিতা বামদেব দাস, নিশামনি দাস ও অপর একজন জমিদার মিলিতভাবে এই নীতি-বিগর্হিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, নিজেদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে বিপন্ন করেও উৎসাহী ও আগ্রহশীল হয়, হরেকৃষ্ণকে শাস্তি দেবার জন্য। সম্পূর্ণ পরোপকার ও সমাজ-হিতৈষা বৃত্তিই তাদের এই কাজে উদ্বুদ্ধ করে। এরা সকলেই ছত্র-চাকদা গ্রামের অধিবাসী এবং বালিকার পিতা ও এরা জাতিতে কাড়ান।

একথা জানা যায় যে, রাজ-সন্নিধানে বালিকার সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল তার এক ভাই ও গ্রামের এক নাপিতকে। তারা রাজ-প্রাসাদে এসে উপস্থিত হ'লে, বালিকাকে অন্দরমহলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার

ভাই ও উক্ত নাপিতকে বহির্বাটীতে বসিয়ে রাখা হয়—অন্দরমহলে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। কনক রাজ-প্রাসাদের মধ্যে অন্তর্হিত হবার মাসখানেকের মধ্যে মারা যায়। এই ব্যাপারে বাইরে প্রচার করা হয় যে, হতভাগিনী বালিকা জ্বর, উদরী প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।

উক্ত ছত্র-চাকদা গ্রামের নন্দকিশোর দাস নামক অপর এক গ্রাজুয়েট যুবকও যুগলকিশোরের সঙ্গে সামাজিক এই সকল অন্যায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে অপরাধীর শাস্তি-বিধানের প্রচেষ্টায় যোগদান করে। রাজার জমিদারীতে মাহান্তি বংশের অন্যান্য যারা বাস করতো, তাদের অধঃপতিত দাসত্বের কবল থেকে উদ্ধার করবার জন্য তারা সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। কারণ, রাজার কাম-চরিতার্থের বিহারক্ষেত্র ছিল ওদের ঐ স্থানটি। নিয়মিত একটির পর একটি, অনেক সময় প্রয়োজনবোধে অথবা বিশেষ বিশেষ উৎসব-উপলক্ষ্যে এক সঙ্গে তিন-চারিটি অনূঢ়া যুবতী, কুমারী তন্বী, এমন কি বিবাহিত সুন্দরীদেরও রাজ-সমীপে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করা হ'ত—উপঢৌকন হিসাবে। রাজা সব সময়ে নিজেই যে সে-সব নারীদের উপভোগ করতেন তা নয়, তাঁর চেলা-চামুণ্ডারা পর্যন্ত রাজভোগের পর এ-সবের প্রসাদ পেতেন,—যথেচ্ছা অত্যাচার করা হ'ত নিরীহ যুবতীদের উপর। কোন কোন সময়ে ঐ সব স্ত্রীলোকদের কিছুদিন উপভোগের পর রাজা তাদের অব্যাহতি দিতেন। তখন তারা আবার স্ব-স্ব গৃহে ফিরে গিয়ে ঘর-সংসার করত—অবিবাহিতাদের বিবাহ হ'ত। আউলরাজ-ষ্টেটের মধ্যে বহুদিন ধরে চলেছিল এমনি সব কদর্য কাণ্ড! কিন্তু কনকবালার এই ঘটনায় অনেকেরই টনক নড়লো, হতভাগিনী বালিকার বিস্ময়জনক মৃত্যুর কথা প্রচারিত হলে, বলিষ্ঠ

মনোভাবসম্পন্ন স্থানীয় যুবকরা—হরেকৃষ্ণ, আউল-রাজ এবং তাঁর পরিচারকবৃন্দের উপর সাধারণের ঘৃণার উদ্রেক করাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে।

১৯৩৭ সালের ২৯এ মার্চ উক্ত নন্দকিশোর ও যুগলকিশোর বিজ্ঞাপনের সাহায্যে ছত্র-চাকদার কাড়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে এক সভা আহ্বান করে। সেই সভায় সদরদে তারা কনক-বিক্রয়ের করুণ-কাহিনী বর্ণনা করে এবং ওজস্বী ভাষায় এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমবেত-ভাবে জনসাধারণকে দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ জানায়। কনকের পিতাকেও এই সভায় হাজির করা হয়। তার উপর আরও অভিযোগ আনা হয় যে, সে কনকের চেয়েও বয়সে ছোট, তার দ্বিতীয় কন্যাকেও রাজার কাছে বিক্রয় করবার মতলবে আছে। উক্ত সভাতেই এই দুই অভিযোগ সম্বন্ধে তার বক্তব্য তলব করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত কৌতূহলের বিষয় এই যে, সভায় উপস্থিত অধিকাংশ লোকের মনেই হরেকৃষ্ণের প্রতি, কন্যা-বিক্রয়ের মত হীন আচরণের জন্য বিশেষ কোন ঘৃণা বা বিরক্তির ভাব প্রকাশ পায় না—পূর্ণ বয়স্ক একটি লোকের যৌন-সংসর্গের পাশবিকতায় অপরিণতা বালিকার বাধ্যতামূলক আত্মদান ব্যাপারটা লোকের মনে বিশেষ কোন ঘৃণার উদ্রেক করে না। হরেকৃষ্ণের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছিল, তাদের জাতির উপর একটা সামাজিক তাচ্ছিল্য আনয়নের জন্য। তাকে রাজার অর্থ ফেরত দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হরেকৃষ্ণ সে-টাকা খরচ ক'রে ফেলেছে জানালে পর, তাকে ক্ষমা করা হয়। এই সময় রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে সে এই বলে যে, 'যেহেতু রাজার ধর্মপত্নীর কোন পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ না হ'লে, তাঁকে মেয়েছেলে সরবরাহ করা আমাদের প্রাচীন প্রথা রয়েছে,

তখন তার আর এতে কি এমন দোষ হয়েছে?' যাই হোক শেষ পর্যন্ত উপস্থিত সকলের কাছে হরেকৃষ্ণ বিনীতভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করে, এবং প্রতিজ্ঞা করে যে, সে এমন কাজ আর কখনও করবে না। এই ব্যাপারে আরও একটা বিষয় বিশেষ লক্ষ্য কররার ছিল যে, এই ঘটনার অল্পকাল পরেই হরেকৃষ্ণ ও তার ছেলেকে রাজার খাস কর্মচারীদের মধ্যে কাজে নিযুক্ত করা হয়।

কিন্তু কনকের মৃত্যুর পর যুগলকিশোর তাদের এই জ্ঞাতীয় অধিবেশনে হরেকৃষ্ণকে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়েই নিশ্চিন্ত হ'ল না। ১৯৩৭ সালের ২৭এ এপ্রিল সে সমস্ত সংবাদ বিবৃত ক'রে পুলিসে সংবাদ দিল। এই কাজে তার পিতা বামদেব দাসও তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। যুগলকিশোর রাজার লোকজন, মনগোবিন্দ এবং বালিকার পিতা হরেকৃষ্ণ প্রভৃতিদের বিরুদ্ধে, একটি নাবালিকাকে অপরের যৌন-লালসা চরিতার্থের উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে বিক্রি করার অভিযোগ আনে—যেটা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭২ ধারা অনুযায়ী অপরাধ বলে গণ্য। পুলিস এই অভিযোগ উড়িয়ে দিতে পারে না; সঙ্গে সঙ্গে দু'জন পুলিস কর্মচারী অনুসন্ধানের ভার নিয়ে গ্রাম পরিদর্শনে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ডেপুটি সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টও রাজার সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে বাধ্য হন।

রাজার অনুচরদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্বন্ধে পুলিসের অনুসন্ধান কার্যের উপর প্রধান বিচারপতি এই মন্তব্য করেন যে, "কর্তব্যের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাসম্পন্ন কোন পুলিস কর্মচারীর উপর তদন্ত-কার্যের ভার পড়লে অন্যান্য আসামীদের সঙ্গে রাজাকেও যে অভিযুক্ত হতে হ'ত তাতে আর সন্দেহ নেই, এবং বালিকার মৃত্যু সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতেও তাঁকে বাধ্য করা হ'ত। তাছাড়া তাঁকেও কাঠ-গড়ায়

হাজির করা হ'ত এবং তাঁর ক্রিয়াকলাপেরও সমুচিত ফল ভোগ করতে হ'ত।"

বিচারপতি আরো বলেন, "আমি বিশেষ জোরের সঙ্গে বলতে চাই যে, আউলের রাজার মত লোকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্তের ভার অপর কোন ব্যক্তির উপর অর্পণ না ক'রে, বিশেষ পদস্থ এবং সর্বতোভাবে বিশ্বস্ত পুলিস কর্মচারীর উপরই ন্যস্ত হওয়া উচিত ছিল। এই ব্যাপারে উর্ধ্বতন পুলিস কর্মচারী তাঁর কর্তব্যের অবহেলা করেছেন। রাজাকে অযথা ভীতি-প্রদর্শন ক'রে কেউ টাকা না নেয়, এটাও যেমন লক্ষ্য রাখা দরকার ছিল, ঠিক তেমনই প্রয়োজন ছিল—রাজাও যাতে উৎকোচ প্রভৃতির দ্বারা পুলিসকে বশ করতে না পারেন, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। এই দুই ব্যাপারের একটিকেও অবহেলা করা যায় না এবং তা করা অত্যন্ত দোষদুষ্ট কাজ।

পুলিসের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং ইন্‌স্‌পেক্টারের কাছে রাজা একটা জবানবন্দী দেন। সেই জবানবন্দীতে তিনি বলেন যে, "বালিকার পিতা অত্যন্ত গরীব; নিজের ভরণপোষণ নির্বাহ করতে না পেরে সে বালিকাকে রাজার কাছে নিয়ে এসেছিল। রাজা তাকে আনবার আদেশ দেননি। বালিকা রাজার অন্তঃপুরেই ছিল এবং পরিচারিকারা দয়াপরবশ হয়ে তাকে দেখাশুনা করতো। কিছুদিন পরে তিনি ভেতর থেকে জানতে পারেন যে, উক্ত বালিকা জ্বর ও উদরী রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে এবং তার চিকিৎসার জন্য ডাক্তার কবিরাজও দেখানো হয়েছিল।" বস্তুতঃ কনকের সঙ্গে যৌন-সংসর্গের কথা রাজা অস্বীকার করেন এবং বালিকাকে পত্নীরূপে বা উপপত্নী হিসাবে তাঁর অন্তঃপুরে গ্রহণ করার কোন অনুষ্ঠান যে হয়নি তাও উল্লেখ করেন।

এই ব্যাপারে মাননীয় প্রধান বিচারপতি পুলিস কর্মচারীদের সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করে বলেন, "এই অভিযোগের সংশ্লিষ্ট তদন্ত-কার্যে নিযুক্ত পুলিস কর্মচারীদের মস্ত বড় কলঙ্ক যে, তাঁরা কনকের মৃত্যু সম্বন্ধে আর কোন তদন্ত না করেই রাজার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বাতিল করেন।"

মামলাটি স্থানান্তরিত করার প্রচেষ্টায় দরখাস্তে কিছু পরিবর্তন করায় রাজার দুই চাকর, মনগোবিন্দ ধল, হরেকৃষ্ণ প্রভৃতি সর্বসমেত বারজন আসামীকে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি. মিশ্রের আদালতে হাজির করা হয় বিচারের জন্য।

ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বালিকার পিতা টাকা গ্রহণের কথা অস্বীকার করে। কিন্তু সে যে বাস্তবিকই টাকা নিয়েছিল, সে-সম্বন্ধে বহু সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিল এবং এ-কথাও জানা গিয়েছিল যে, সে টাকার পরিমাণ ছিল পাচশত। তাছাড়া হরেকৃষ্ণ তাদের জাতীয় অধিবেশনে সর্বসমক্ষে এবং কয়েকজন সাক্ষীর কাছেও স্বীকার করেছিল যে, সে টাকাটা বাস্তবিকই নিয়েছিল। টাকা যেদিন নেওয়া হয়, সেদিন রাত্রে হরেকৃষ্ণের বাড়িতে সেই টাকা থেকেই এক ভোজের আয়োজন হয় এবং কাড়ান সম্প্রদায়ের প্রায় অর্ধেক লোক তাতে যোগদান করে, বাকী বহু লোক এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেনি।

কনক যে সত্যিকার স্বাস্থ্যবতী ও সুন্দরী ছিল সে সম্বন্ধে সাক্ষীরা সকলেই একমত হয় এবং বালিকা যে তখনও যৌবনে পদার্পণ করেনি, বহু সাক্ষ্যের সাহায্যে তাও প্রমাণিত হয়। হরেকৃষ্ণ তার কন্যা কনকের বয়স আঠারো উনিশ বৎসর উল্লেখ করে, কিন্তু সেকথা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যায়। .গ্রামের প্রতিবাসী যারা বালিকাকে নিত্য দেখতো

তারা বলে যে, কনকের বয়স বারো তেরোই ছিল, কারণ তার বেশী হ'লে প্রকাশ্যে বাইরে বেরুনো তার পক্ষে সম্ভব ছিল না—এটা তাদের জাতির রীতি-বিরুদ্ধ।

স্যার কোর্টনে টেরেল এই হতভাগিনী বালিকার রহস্যজনক মৃত্যু সম্বন্ধে বলেন :

…"আমি আবার বলি,—এই সময় কনক অল্পবয়স্কা নাবালিকা মাত্র। তখনও সে যৌবনে পদার্পণ করেনি ; তবে সে স্বাস্থ্যবতী ও সুন্দরী ছিল। রাজার এই সময় বয়স হয়েছিল বিয়াল্লিশ বৎসর এবং তাঁর অন্দরে বহু-সংখ্যক রক্ষিতা ছিল। ফৌজদারী মামলার আসামী এবং এই মামলার বাদীরা মিথ্যা-কাহিনী রচনা ক'রে বলবার চেষ্টা করেছে যে, বালিকা জ্বর ও উদরী রোগে মারা যায়, ইত্যাদি। এই বয়সের নাবালিকাদের এক মাসের মধ্যে উদরী রোগ হওয়া সম্ভব নয়। সে যে রোগাক্রান্ত হয়ে কোন প্রকারে চিকিৎসিতা হয়েছিল মনে হয় না, সুতরাং রাজার অন্দরমহলের অন্ধকারে মৃত্যুর কারণ সহজেই অনুমেয়।

"এ ছাড়া সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণগুলি আসামীর বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেয়। যথা : টাকা দেওয়া ; বালিকার বয়স তেরো থেকে চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে, এবং বাস্তবিক পক্ষে তাকে রাজার কাছে বলপূর্বক নিয়ে যাওয়া। কিন্তু আসামী এমন অসাধারণভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিল যে, সেটা বিস্ময়কর এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নির্ভরযোগ্য মনে হয়। 'পঁচিশ সওয়াল' নামক পুস্তকের উল্লিখিত রীতিই গৃহীত হয়েছিল। তাতে উল্লেখ আছে যে, রাজা ইচ্ছা করলে যে কোন কাড়ান বালিকার পাণিগ্রহণ করতে পারেন,—তা সে নাবালিকাই হোক বা নাই হোক। এ-কথা সত্য 'পঁচিশ সওয়াল' গ্রন্থে এ-কথা উল্লেখ আছে যে, উত্তরাধিকার বিষয়ে আউল

রাজার কামলীলা

রাজ-পরিবারের ধর্মপত্নীর গর্ভজাত উত্তরাধিকারীর অবর্তমানে, নিম্ন শ্রেণী থেকে গৃহীত অপর পত্নীর গর্ভজাত সন্তান উত্তরাধিকারী হতে পারে। এই সূত্রে রাজার পক্ষে বালিকা কনককে গ্রহণ করা সিদ্ধ বলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু এই উপ-বিবাহ প্রথা সম্বন্ধেও উক্ত গ্রন্থে বলা আছে যে, কেবলমাত্র পরস্পরের অভিলাষ থেকে, পরস্পরের সম্মতিতেই এই বিবাহ সম্ভব হতে পারে এবং সে-মিলনও উভয় পক্ষীয় সামাজিক প্রথায় অনুমোদিত হওয়া দরকার এবং উভয়ের মালা-বদলের দ্বারা সেই সম্মতি প্রকাশিত হওয়াও আবশ্যক। কিন্তু এই প্রথার বাস্তব অনুষ্ঠানের নজীর এতই নগণ্য যে, তাকে বাস্তব প্রতিপন্ন করবার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। রাজার বহু উপপত্নী আছে, তাদের স্তর অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যথা: চৌকীবাঈ, ফুলবাঈ, মালাবাঈ প্রভৃতি।

"কিন্তু এটি খুবই পরিষ্কার যে, ঐ সকল হতভাগিনী নারীরা যাদের বিভিন্ন নামে উল্লেখ করেছি, তারা রক্ষিতা ছাড়া আর কিছুই নয়; বিবাহিতার কোন মর্যাদাই তাদের নেই—কোন ক্রমেই তারা পরিণীতা স্ত্রীর পর্যায়ে পড়ে না। তাদের ভরণপোষণের জন্যে যৎসামান্য অর্থ দেওয়া হয় মাত্র, তাছাড়া তারা রাজ-অন্তঃপুরের বন্দিনী বিশেষ। রাজা তাদের দেহের উপরই কেবল কর্তৃত্ব বজায় রাখেন যতদিন তাঁর ইচ্ছা, অথবা যতদিন না মৃত্যু এসে তাদের মুক্তি দেয়।"

রাজার যে সকল অনুচরকে ফৌজদারী মামলায় আসামী করা হয়েছিল, এবং পরে যারা দেওয়ানী মামলার বাদী হয়েছিল, যে মামলাটা আপীল করা হয়েছিল, তারা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭২ ধারার দু'নম্বর বিশ্লেষণীর উপর জোর দিয়ে যা বলেছিল তা হচ্ছে:

"এই ধারায় উল্লিখিত "অবৈধ সংসর্গ" অর্থে বুঝতে হবে সেই

স্ত্রী-পুরুষের যৌন-মিলন যারা বিবাহিত নয়, অথবা এমন কোন বন্ধনে বা মিলনে যুক্ত নয় যেটা বিবাহের সমতুল্য না হলেও, ব্যক্তিগত নীতি অথবা যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সে সম্প্রদায়ের প্রথা অনুসারে অনুমোদিত, কিম্বা ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হলে তারা এমন সম্প্রদায়ভুক্ত যে উভয়ের মধ্যে উপ-বিবাহ জাতীয় মিলন সম্ভব ব'লে প্রচলিত।

"ম্যাজিষ্ট্রেট সম্ভবতঃ অবহেলাই করেছিলেন ব্যাপারটা, যে ক্ষেত্রে রাজা প্রকাশ্যভাবেই অস্বীকার করেছিলেন যে তাঁদের মধ্যে কোন-প্রকার পরিণয়-ক্রিয়া হয়নি এবং তিনি এই মামলায় সাক্ষ্য দেবার জন্যেও উপস্থিত হননি। তাছাড়া ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারের সময়ে অথবা বর্তমান দেওয়ানী মামলাতেও এমন কোন প্রমাণ নেই, যে কোন অনুষ্ঠান হয়েছিল। যেটা হয়েছিল এবং যে অনুষ্ঠানের প্রমাণ আছে, সেটা হচ্ছে রাজার প্রদত্ত টাকায় হরেকৃষ্ণর গৃহে তার অনুষ্ঠিত ভোজ। কোন প্রকার বিবাহ-অনুষ্ঠানের প্রমাণ কোথাও বিন্দুমাত্র নেই।

"এ বিতর্কও উত্থাপন করা হয়েছিল যে, এই সকল উপপত্নী গ্রহণের বিবাহ গন্ধর্ব প্রথাতেই অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ মালাবদলের দ্বারা পরস্পরের সম্মতিতেই এই ধরনের মিলন হয়ে থাকে। কিন্তু একথা কিছুতেই বিশ্বাস করা সম্ভব নয় যে, কনকের মত সুকুমারী বালিকার পক্ষে এত প্রবীণ বয়সের বর্বরের সঙ্গে মিলিত হবার কোন ইচ্ছা থাকতে পারে। বস্তুতঃ হিন্দু আইনে 'গন্ধর্ব বিবাহ' সিদ্ধ বলে গণ্য, কিন্তু কোন নাবালিকা এরূপ বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না, কারণ এইরূপ বিবাহে যে সকল সম্মতি দেওয়ার প্রয়োজন হয়, নাবালিকার তেমন যোগ্যতা থাকে না। প্রকৃতপক্ষে বালিকা তাঁকে কখনও দেখেনি। তাছাড়া সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা যায় যে, সে বলেছিল বরং সে আত্মহত্যা করবে, তবু ওখানে

যাবে না। তার কান্নাকাটি ও ওখানে না যাবার জন্য নানা বাধা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও জোর ক'রে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।...

"এ সম্বন্ধে কোন আলোচনাই নিরর্থক যে কাড়ান জাতির পিতাদের মধ্যে প্রথা ছিল কন্যাকে আউল-রাজের উপপত্নী করবার জন্য দিয়ে আসা। এরকম কোন প্রথাই কোন দিন স্বীকৃত হয়নি এবং এরকম কোন প্রথার প্রচলন থাকলেও সেটা অত্যন্ত অমানুষিক এবং বৃটিশ ভারতীয় আইন অনুশাসনে এই প্রথার কোন আইনগত অনুমোদন থাকতে পারে আমি স্বীকার করি না।...

"অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে ওজর কখনও খাটতে পারে না, সেই ওজরই খেটেছিল এবং এই অজুহাতেই আসামীদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল।"

রাজা ও তাঁর অনুচরেরা মামলায় জয়লাভ করেছিল, কিন্তু ফরিয়াদী পক্ষ আপীল রুজু করেনি এই মনে করে যে, তাদের যতই ন্যায়সঙ্গত কারণ থাক, ঐ শক্তিশালী শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে আপীল করা বৃথা এবং গভর্ণমেণ্টও এই লজ্জাকর অব্যাহতি-দানের বিরুদ্ধে আপীলের কল্পনাও করতে পারেনি। এ বিষয়ে প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন যে:

"গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দৃষ্টি এ-বিষয়ে আকৃষ্ট হওয়া বিশেষভাবে উচিত ছিল, এবং এই ধরনের উদ্ভট বিচারের বিরুদ্ধেও যে কোন আপীলের চেষ্টা করা হয়নি তা লজ্জাকর। এটা বৃটিশের শাসন ও বিচার ব্যবস্থায় অত্যন্ত কলঙ্কের বিষয়—মহামান্য সম্রাটের পক্ষে রুজু মামলায় বিচারের এই অপব্যবহারকে অবাধে অনুষ্ঠিত হতে দেওয়া উচিত হয়নি।"

ফৌজদারী মামলায় জয়লাভের পর বল সঞ্চিত হলে, রাজা সেই

সমাজ-সংস্কারক দলের নিধন-সাধনে এমন উঠে পড়ে লাগলেন—যাতে তারা আর তাদের মাথা তুলতে না পারে। তিনি সেই সংঘের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করলেন। কিন্তু ধর্মের কল ধীরে ধীরে যথার্থই নড়তে লাগলো। রাজা ভাবতেই পারেন নি যে, এর ফলে তাঁর কীর্তিকলাপ প্রকাশিত হয়ে লজ্জাকর অবস্থায় তাঁকে এনে ফেলবে। ফৌজদারী মামলায় রাজাকে যে মর্মপীড়া ও যন্ত্রণাভোগ করতে হয়েছিল, তারই ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একটা মোটা টাকা দাবি ক'রে সংস্কারকদের বিরুদ্ধে তিনি এক দেওয়ানী মামলা রুজু করে দেন।

কটকের নিম্ন আদালতের জজ, অঘোরী নিত্যানন্দ সিংহের এজলাসে মামলার শুনানী হয়। ফৌজদারী মামলার বেলাতেও যেমন হয়েছিল, রাজা কোন সাক্ষ্য দিতে ভয় পেলেন এবং তাঁর সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই বলেই ধরা হ'ল। কনকের বয়স সম্পর্কে ভূরি ভূরি সাক্ষ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও পূর্বকথিত সামাজিক প্রথার বশবর্তী তুচ্ছ যুক্তিই প্রাধান্যলাভ করলো। বালিকার বয়স যে বারো তেরো বৎসর সে-সম্বন্ধে বিচারক তাঁর অবিশ্বাসই প্রকাশ করলেন, এবং সে বিষয়ে তাঁর যে অভিমত তা অত্যন্ত বিকারদুষ্ট হ'ল। কোন প্রকার বিবাহের অনুষ্ঠান যে হয়নি, সেদিকটা তিনি একেবারেই দেখতে পাননি। তিনি হয়ত সত্যিই এইটুকুই দেখেছিলেন যে, সংস্কারক দল রাজার অনুচরদের অভিযুক্ত করবার চেষ্টাই প্রত্যক্ষভাবে করেছিল এবং তাঁর হয়ত এও মনে হয়ে থাকবে যে, ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক তাদের অব্যাহতি দেওয়াতেই প্রমাণ হয় যে, মামলাটির পশ্চাতে কোন যুক্তিতর্ক এবং সম্ভবপর কারণ ছিল না। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রাজার প্রাসাদে যদি কোন রকম বিবাহের অনুষ্ঠানও হ'ত, সে অনুষ্ঠানের গোপনীয়তা সত্ত্বেও ঐ দলের পক্ষে যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত

কারণ ছিল অভিযোগ করবার। মামলায় সহায়তা করবার অভিপ্রায়ে আসামীরা যে কোন মিথ্যা সাক্ষ্যের অবতারণা করবার চেষ্টা করেছিল, অথবা এমন কোন কাজ করেছিল যেটা কোন সৎ গ্রামবাসীর করা উচিত নয়—তার কোন প্রমাণ নেই। বিবাহের কোন প্রমাণই ছিল না, তা সত্ত্বেও নিম্ন আদালতের বিচারপতি অভিমত প্রকাশ করেন যে, রাজা কর্তৃক বিবাহের কথার পুরোপুরি অস্বীকার করাটা মার্জনীয়, কারণ অভিযুক্ত হবার আশঙ্কাবশেই তা তিনি করেছিলেন এবং ঘটনা পরম্পরায় দেখা গেছে যে, রাজা তাঁর বিবৃতি অস্বীকার করবার চেষ্টা করেন নি।" রাজা তাঁর মানসিক যন্ত্রণা ও হয়রানির দরুণ ২০০০৲ টাকা ক্ষতিপূরণের হুকুমনামা পান এবং তাঁর পরিচারকদের বিরুদ্ধে আনীত মামলার ব্যয়ের দরুণ আরও ৩০০০৲ টাকার দাবি মঞ্জুর করা হয়। রাজার অনুচরদের অনুকূলেও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, এবং সর্বসাকুল্যে রাজা এবং তাঁর সহকারীদের পক্ষে মিলিতভাবে ৬৯৯৯৲ টাকার ডিক্রি জারী করা হয়।

"এ কথা ভাবলে সত্যিই হতাশ হতে হয় যে, ন্যায় বিচারের ভার এই রকম সব বিচারকের উপর কখনও ন্যস্ত হতে পারে!" প্রধান বিচারপতি এ সম্পর্কে এই ধরনের মন্তব্য করতেও কুণ্ঠিত হননি।

নিম্ন আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে পাটনা হাইকোর্টে আপীল করা হয়। স্যার কোর্টনে টেরেল ও স্যার খাজা মহম্মদ নুরের আদালতে মামলার শুনানী হয়। নিম্ন আদালতের বিচারপতি প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ বাতিল করে দেন বিচারপতিদ্বয়; তাছাড়া সংস্কারকদের আপীলে যা ব্যয় হবে তাও আউলের রাজাকে বহন করবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই আপীল মামলার উপসংহারে প্রধান বিচারপতি একটি চমকপ্রদ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন:

"কেবলমাত্র একটি আলোকরশ্মি এই রহস্যময় কাহিনীর সমাধানে সহায়তা করেছে। কাড়ান সম্প্রদায়ের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে থেকে এই সংস্কারকদলের উত্থানে দু'নম্বর আসামী নন্দকিশোর যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছে তা উল্লেখযোগ্য। সামাজিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশে সৎ-আদর্শের পথ-প্রদর্শকের নির্যাতন পাবার জন্য প্রস্তুত থাকতেই হয়, এবং তাদের উচ্চাদর্শের পথ বন্ধুর এবং দুস্তর হওয়াই স্বাভাবিক। দাসবৃত্তি-সম্পন্ন অনুন্নত জনসমাজ, যারা তাদের কন্যাদের স্বাস্থ্য-সুখের প্রতি লক্ষ্যই করে না, তাদের মধ্যে মানবতার উচ্চাদর্শের আবেদন কার্যকরী হয় না বললেই চলে। কিছুকালের জন্যে এই জাতীয় কৌলীন্যবোধ জাগাবার চেষ্টা সীমাবদ্ধ রাখতে হয়।

"উপসংহারে আমি কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব করছি যে, আউলের রাজা এবং ঐ জাতীয় অপর লোকদের উপর যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়।"

প্রধান বিচারপতির রায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ তাতে পুলিসের কাজের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে, এবং ম্যাজিস্ট্রেট ও নিম্ন আদালতের বিচারকের উপরেও ভয়ঙ্কর দোষারোপ করা হয়েছিল। পুলিসের তদন্ত সম্বন্ধে প্রধান বিচাপতি মন্তব্য করেন, "কর্তব্যবোধের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাবান পুলিস কর্মচারীর উপর এই কাজের ভার অর্পিত হলে নিঃসন্দেহে রাজাকেই বালিকার মৃত্যু সম্বন্ধে সুসঙ্গত কৈফিয়ৎ দিতে হ'ত। তাঁকে আদালতে হাজির হতে হ'ত এবং তাঁর কাজের সমুচিত ফলও তিনি পেতেন।" বিচারক আরও বলেন যে, "তদন্তের কাজ যে সকল লোক করেছিল, তাদের উপর ছেড়ে না দিয়ে, সম্পূর্ণ বিশ্বাসী নির্ভরযোগ্য পুলিস কর্মচারীর উপরই তদন্তের ভার দেওয়া

উচিত ছিল। রায়েতে রাজার অনুচরদের 'কোটনা' (pimp) আখ্যা দেওয়া হয়েছিল, এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে 'অযোগ্য' এবং পুলিস কর্মচারীদের 'অবিশ্বাসী ও অমনোযোগী' বলা হয়েছিল। মাননীয় প্রধান বিচারপতি অন্যান্য উচ্চপদস্থ বিচারকদের সম্বন্ধেও তীব্র মন্তব্য ক'রে তাঁদের 'অকর্মণ্য ও দৃষ্টিহীন' বলতেও কুণ্ঠিত হননি।

কিন্তু দণ্ডমুণ্ডের বিধানকারী বিদগ্ধ বিচারকদের এই সমস্ত বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যেও সত্যিকার অপরাধী আউলের চরিত্রহীন রাজা ব্রজসুন্দরকে আপাতদৃষ্টিতে আমরা তাঁর দুষ্কৃতির কোন ফলই ভোগ করতে দেখি না—মানুষের, সমাজের ও বিচারকদের চক্ষে তাঁর খানিকটা হেয় প্রতিপন্ন হওয়া ছাড়া, বিচারের মানদণ্ডে শাস্তি তাঁকে কিছুই পেতে হয়নি। অসহায়া নাবালিকার উপর অমানুষিক অত্যাচারের ফলে কনকের যে মৃত্যু ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে আর কেউ না জানলেও, বিচারকের বিচারক, সর্বনিয়ন্তা ভগবান,—অলক্ষ্যে যাঁর দৃষ্টি আমাদের গোপনীয় সমস্ত কিছুই নিরীক্ষণ করে থাকে, তিনি নিশ্চয়ই তাঁর বিচারে ব্রজসুন্দরের এই কৃত-পাপের সমুচিত শাস্তি-বিধানের ব্যবস্থা করেছিলেন। পূর্বজন্মের কোন সুকৃতির ফলে লোকচক্ষে প্রত্যক্ষভাবে তিনি শাস্তি না পেলেও, দুষ্কৃতির ফল তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল, এই জীবনেই। কৃতকর্মের ফলস্বরূপ অনুশোচনার অনলে তিনি দগ্ধ হয়েছিলেন দিনের-পর-দিন। দুর্ভাবনায় বহুদিন অন্নগ্রহণ করতে পারেন নি—অশান্তিতে চোখে ঘুম আসেনি; জেগে কাটিয়েছেন রাতের-পর-রাত। রাত্রে তন্দ্রার মধ্যে চমকে চমকে উঠতেন রাজা ব্রজসুন্দর। কনকের স্নিগ্ধ ভীরু দুটি চোখ, ঢলঢলে নির্মল মুখ, আরক্তিম ওষ্ঠাধর,—যা দেখে

একদিন তিনি কাম-বিহ্বল হয়ে হিংস্র পশুর মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, নিজেকে সংযত করতে পারেন নি—পৈশাচিক প্রবৃত্তির তাড়নায় তাকে দলিত, মথিত, ক্ষতবিক্ষত করতেও কুণ্ঠিত হননি, সেই মুখ হঠাৎ হঠাৎ ভেসে উঠত তাঁর চোখের সামনে। কনকের সেই ভীরু চোখ থেকে তখন অগ্নির স্ফুলিঙ্গ ছিটকে এসে তাঁকে যেন পুড়িয়ে মারতে চাইত—কি মারাত্মক ভয়াবহ সে-দৃষ্টি! কেবলি তাঁর মনে হ'ত, তাঁর উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই কনক যেন সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁর চারিদিকে! ঘুমন্ত চীৎকার ক'রে উঠতেন ব্রজসুন্দর—একলা বেরুতে পারতেন না, ঘুমতে পারতেন না, খেতে পারতেন না! অতুল ঐশ্বর্য ও রাজকর্মচারী পরিবৃত থেকেও যন্ত্রণার অবধি ছিল না তাঁর। কিছুদিন প্রায় পাগলের মতই হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সব সময়েই সমাজ-সংস্কারক দলের লোকেরা, যুগলকিশোরের লোকেরা তাঁকে হত্যা করবে, এই আতঙ্কে জীবন্তেই তিনি মৃতপ্রায় হয়েছিলেন! দুশ্চিন্তার দাহনে তাঁর নধরকান্তি দেহ প্রায় কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছিল।

কনকের মৃত্যু সম্বন্ধে গোপনীয় সমূহ ঘটনা বিশদভাবে আমরা বিচারের মধ্যে জানতে না পেলেও, অথবা ফাঁসির-মঞ্চে ব্রজসুন্দরকে দেখতে না পেলেও, তাঁর কৃতকর্মের ফল এই ভাবেই তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল বহুদিন—এই ইহজীবনেই রাজপ্রাসাদে থেকেও, কারাগৃহে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অপরাধীর মত তাঁকে দিন কাটাতে হয়েছিল। মানুষের দেওয়া শারীরিক শাস্তির চেয়ে, এই অসহ্য মানসিক শাস্তির হাত থেকে তিনি রেহাই পাননি।